বাঙ্গালার
বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি

পরিবর্তিত
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., তত্ত্বরত্নাকর,
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক,
কটন কলেজ, গৌহাটী
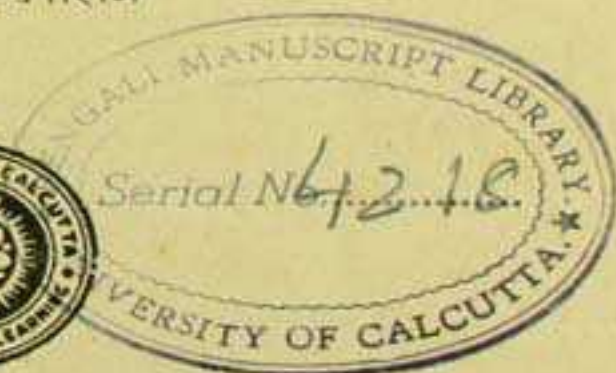
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬২

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিশ্বাসী

ভারত-রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষাসচিব

মাননীয় মওলানা

আবুল কালাম আজাদ সাহেবের

করকমলে

শ্রদ্ধার সহিত উৎসৃষ্ট হইল

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "খুজাস্তা আখতর বানু সুহ্‌রাওয়ার্দী-সুবর্ণপদক" প্রতিযোগিতার জন্য এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছিল। গত ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট উক্ত সুবর্ণপদক ইহা লাভ করে।

এই পুস্তিকার মধ্যে এমন কয়েকজন মুসলমান মনীষীর পরিচয় আছে, যাঁহারা একেশ্বরবাদী ইস্‌লামের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াও অন্তরের উদারতায় হিন্দু দেবদেবীর কথা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মসমন্বয়ের ও ধর্ম্মসহিষ্ণুতার যে মহতী বাণী এই সকল তথাকথিত অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর কবিদের মধ্যে আছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী মুসলমান কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত পদসমূহ আস্বাদন করিতে গিয়া আমি সাধারণতঃ কোন হিন্দু কবির অনুরূপ ভাবের পদ উদ্ধৃত করি নাই। কারণ, হিন্দু কবিদের মধ্যে এজাতীয় পদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমি কেবল কয়েক ক্ষেত্রে হিন্দীভাষার মুসলমান কবির পদ উদ্ধৃত করিয়াছি।

যে সুবর্ণপদক প্রতিযোগিতার জন্য এই পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল, সেই সুবর্ণপদক-প্রদাতা স্বর্গত ডাঃ আবদুল্লা আল-মামুন সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়-মূলক বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রত্যেক দেশহিতকামীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, ততই এদেশের পক্ষে মঙ্গল।

বর্ত্তমান অবস্থায় গৌহাটীতে থাকিয়া কলিকাতায় পুস্তক মুদ্রণ এক দুরূহ ব্যাপার। প্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলবিহারী

বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. লিট্. (অক্সন) মহাশয় এই পুস্তিকা প্রকাশের বন্দোবস্ত করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন শিলংনিবাসী আমার আত্মীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

ভারতের মুক্তি-সাধনার নিরলস সাধক, ইসলাম ধর্ম্মের অখিল-শাস্ত্রদর্শী মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নিকট আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়া প্রীতিভাজন কবি ও মনীষী হুমায়ুন কবির সাহেব আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব আমার এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রশংসা করিয়া যে উৎসাহবাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইতি—

"স্বাধীনতা দিবস"
১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ ইং।
মোক্ষদা-কুটীর
আটগাঁও, গৌহাটী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবির প্রথম সংস্করণ "শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা"-রূপে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে নূতন ২২ জন কবির পদ, বর্ণানুক্রমিক কবি-সূচী ও পদসূচী সংযোজিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৬৩ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি'-শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মুসলমান কবি রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদ আস্বাদনে ডাঃ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ সহায়ক হইবে মনে করিয়া তাঁহার অনুমতি সহ ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

লিপিপ্রমাদবশতঃ ১৬ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় 'ছহিফা' 'ছহিকা' রূপে, ৫৫ পৃষ্ঠায় 'খতিশা' 'খতিশ' রূপে এবং ১৪৮ পৃষ্ঠার ৪(ক)—১৪১ পৃষ্ঠার ৪(ক) রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এজন্য আমি দুঃখিত। ইতি—

মোক্ষদা-কুটীর,
আটগাঁও, গৌহাটী
২৩।৪।৬২

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

ভূমিকা

সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান গ্রন্থের নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'বাঙ্গালার' দ্বারা আধুনিক ভৌগোলিক বঙ্গদেশকে নির্দ্দেশ না করিয়া বঙ্গভাষাভাষি-অধ্যুষিত অঞ্চলকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার ফলে 'বাঙ্গালা' সংজ্ঞার মধ্যে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ অঞ্চল ও কাছাড় জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'পদকল্পতরু', 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে উড়িষ্যার কবি সালবেগের পদ স্থান পাইয়াছে। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত আকবর-ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে। সম্ভবতঃ এই পদরচয়িতা জনৈক ফকির ছিলেন। সালবেগ ও আকবরের পদ বাঙ্গালা পদসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমরাও বর্ত্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে উভয়ের পদ উদ্ধৃত করিয়াছি। অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত 'আবাহন' পত্রিকার 'আঘোণ ১৮৫৪ শক' সংখ্যায় ছৈয়দ হাজান আলি লিখিত—'অসমিয়া মুছলমানী পুথি' শীর্ষক প্রবন্ধে গোলাম হুছন নামক জনৈক মুসলমান কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থলেখক কবি গোলাম হুছনকে বাঙ্গালী কি অসমীয়া স্থির করিতে না পারিয়া, বিশেষজ্ঞদের উপর কবির পরিচয় নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। ভাষার দিক্ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে পার্থক্য বড় অল্প। এই কবিকে বাঙ্গালী বলিলে অন্যায় হইবে না মনে করিয়া ইহার গানও উদ্ধৃত হইল।

'বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'—একেশ্বরবাদী মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি ভাবে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। একেশ্বরবাদী মুসলমানদের পক্ষে 'বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন' হওয়া অনেকটা অস্বাভাবিক বলিতে হইবে ; কিন্তু এই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কেন এরূপ ঘটিল, তাহারই কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

(ক) বাঙ্গালাদেশের আধুনিক মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশেরই পূর্ব্বপুরুষ কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। এ স্থলে 'হিন্দু' সংজ্ঞাদ্বারা ভারতবর্ষে উদ্ভূত বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীকেই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে মূর্ত্তিপূজা, যাগযজ্ঞ, ব্রতপার্ব্বণ প্রভৃতি

অনেকটা তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু শত শত বৎসরের যে সংস্কার তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইল না। ইহা তাহাদের অন্তরতলে ফল্গুধারার মত রহিয়া গেল। অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে ইহা সময় সময় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

(খ) হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা মুসলমান হইলেন, তাঁহারা হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি হইতে বিরত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সাধনার যে সহজ দিক্—যাহাতে ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সেইদিক্ তাঁহাদের সকলের মন হইতে মুছিয়া গেল না। প্রেমসাধনার মধ্য দিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া, যে ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাহা ইহাদের কাহারও কাহারও নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। এইরূপ সাধনা ইহাদের কাহারও কাহারও আন্তরিক কামনার বস্তু হইয়া রহিল। এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত্ত প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না—জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবির নিকট অপৌরুষেয়। ইঁহারা বৃষভানুনন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই,' 'কানু ছাড়া উপমা নাই'—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) এদেশে হিন্দুধর্ম্ম-পরিত্যাগকারী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তাহার পূর্ব্বের মর্য্যাদা হইতে অনেকখানি বিচ্যুত হইল। যে আভ্যন্তরিক শান্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাবের জন্ম এই দুই মহাকাব্য হিন্দুদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রায় কোন প্রভাবই মুসলমানদের উপর রহিল না। রাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় সেই-সকল কাহিনী ইঁহারা তাঁহাদের নবলব্ধ ধর্ম্মের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া মানিতে পারিলেন না। তাই কালক্রমে এদেশীয় মুসলমানদের নিকট বহুদেবতার পূজক হিন্দুদের ধর্ম্মকাহিনী পাঠের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। চর্চ্চার অভাবে এইজাতীয় অধিকাংশ কাহিনীই মুসলমানরা কালক্রমে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু চৈতন্যযুগে যখন প্রেমের প্রবল বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত, তখন তাহা মুসলমানদের আঙ্গিনার মধ্যেও প্রবেশ করিল। প্রায় সেই সময়ই

প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণব-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পদাবলীরূপে পরিস্ফুট হইয়া নৃত্যে ও সঙ্গীতে বাঙ্গালার গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। এই প্রেমসঙ্গীত-মন্দাকিনী শুধু হিন্দুর গৃহপাশেই প্রবাহিত হয় নাই, মুসলমানদের আঙ্গিনার পাশ দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার ফলে হিন্দুরা এই মন্দাকিনীর পূতবারি পানে যেরূপ কৃতার্থ হইয়াছেন, মুসলমানরা সেইরূপ না হইলেও প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য এই ধারা হইতে যে সময় সময় বারি আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হিন্দু কবিরা এই ভাবগঙ্গায় স্নাত হইয়া জাহ্নবীর অশেষ বীচিবিভঙ্গতুল্য অসংখ্য কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার শাশ্বতমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ এই ভাবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ নাম উল্লেখ করিয়া প্রেমের কথা গাহিয়াছেন।

(ঘ) বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় সুফীপন্থী। ইহারা ফার্সী সুফীমতবাদ-মূলক বিরাট্ সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ আংশিক যে পরিচিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফার্সী সাহিত্যে লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ্ প্রভৃতি প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়া কোথাও কোথাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমমূলক সম্বন্ধই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঙ্গালার সুফীভাবাপন্ন মুসলমান কবিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতে যাইয়া লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ্ প্রভৃতি রূপক ব্যবহার না করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় রূপক রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন। ফার্সী রূপক ব্যবহার না করিয়া রাধাকৃষ্ণ-রূপক ব্যবহারের অন্যতম কারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এদেশীয় হিন্দুকবি-রচিত গানের গায়ক ও শ্রোতা যেরূপ অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান, তদ্রূপ মুসলমান-কবি-রচিত গানের গায়ক ও শ্রোতাও অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু। ফার্সী রূপকের ভিতর দিয়া সুফীপন্থী মুসলমান কবিরা তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে গেলে প্রতিবেশী হিন্দুরা ও সুফীমতবাদের সহিত অপরিচিত মুসলমানরা তাহা বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন না মনে করিয়াই সম্ভবতঃ এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানদের বহুশ্রুত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনীকেই রূপকে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সুফীমতবাদী মুসলমানগণ ব্যতীত বাউল, সাঁই ও দরবেশপন্থী মুসলমানদের কথাও বলা যাইতে পারে।

(ঙ) খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যেমন মাইকেল 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনা করিয়াছেন, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব না হইয়াও যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা সম্ভব হইয়াছে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী না হইয়াও যেমন বহু পুরুষ ও

মহিলা কবি রাধাকৃষ্ণপ্রেম-মূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, ঠিক সেইরূপ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী কোন কোন কবিও রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত কবিতা রচনা করিয়া প্রেমধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে কবিত্ব আছে, অধিকন্তু কাব্যাকারে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে যিনি সক্ষম, তিনি প্রেমের গান গাহিবেনই। গান গাহিতে গিয়া গায়কদের মধ্যে যেমন কেহ সারঙ্গ, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ এসরাজের সাহায্য লন, প্রায় অনুরূপভাবে প্রেমের কথা বলিতে যাইয়াও কেহ আসিক-মাসুক, কেহ শিরি-ফরহাদ্, কেহ লায়লী-মজনু, কেহ মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষবধূ, অথবা কেহ রাধাকৃষ্ণ রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন। মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রতিবেশী হিন্দুলেখককর্ত্তৃক যেজাতীয় শব্দ, উপমা ও রূপক সচরাচর ব্যবহৃত হইত, মুসলমান কবিদেরও কেহ কেহ সেইজাতীয় শব্দ, উপমা ও রূপকের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই-সকল কবির পক্ষে সময়ের প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই ইঁহারা বৈষ্ণবভাবে খানিকটা অনুপ্রাণিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদ রচনা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

(চ) বাঙ্গালাদেশের মুসলমান কবিদিগকে রাধাকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীত রচনা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে অপর ধর্ম্ম বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। আমরা এস্থলে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব। ইউরোপখণ্ডের বিভিন্ন অংশের সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সহিত গ্রীক সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য কতখানি। কিন্তু এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, একের প্রভাব অন্যের উপর পড়িয়াছিল, একের আদর্শ অপরে গ্রহণ করিয়াছিল। 'রিনায়সেন্স' (Renaissance) যুগে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডে—দেশভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ ও যুগভেদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গ্রীক্ সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 'প্যাগান' ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এসময়কার কবি ও শিল্পীরা প্যাগান ভাব ও আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ও গ্রীক্ সভ্যতার সমন্বয়ের ফলে, ইংলণ্ডে যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইল তাহা ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যমণি রূপেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বিরুদ্ধ কৃষ্টি ও ভাবসমন্বয়জাত ইংরেজী সাহিত্যের

'এলিজাবিথান' (Elizabethan) যুগ যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই সমন্বয়ী মনোভাবের এক চমৎকার নিদর্শন মিল্‌টনের জীবনে তথা কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মিল্‌টন একাধারে পিউরিটান খ্রীষ্টান ও প্যাগান উভয়ই। গঙ্গাযমুনা-ধারার মত এই দুই যুগ্ম-ধারা একই ব্যক্তির জীবনে ও কাব্যে মিলিত হইয়াছে। দেশভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ ও যুগভেদ—এই ভেদচতুষ্টয় সত্ত্বেও যেস্থলে একের প্রভাব অন্যের উপর পূর্ণমাত্রায় পতিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে, সেস্থলে ভারতীয় মুসলমানদের খানিকটা হিন্দুভাবে ভাবিত হওয়া আশ্চর্য্যজনক মনে করিব কেমন করিয়া? এক্ষেত্রে দেশভেদ, জাতিভেদ ও যুগভেদের প্রশ্ন উঠে না *—ধর্ম্মভেদ মাত্র রহিয়াছে। ভারতীয় মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট হিন্দুভাবের দ্বারা কতটুকু অনু-প্রাণিত হইয়াছেন, তাহারই কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিন্দুরাও মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, এবং ইহা খুব স্বাভাবিকও বটে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে বাঙ্গাদেশের বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। এই আলোচনার সঙ্গে চারিটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে। প্রথম বা 'ক' পরিশিষ্টে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন প্রত্যেক মুসলমান কবির এক একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় বা 'খ' পরিশিষ্টে এই-সকল কবির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তৃতীয় বা 'গ' পরিশিষ্টে যে কয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চতুর্থ বা 'ঘ' পরিশিষ্টে যে-সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত ও 'ক' পরিশিষ্ট সঙ্কলিত, তাহাদের এক তালিকা বিন্যস্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'ক'—গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে প্রত্যেক কবির রচনার নিদর্শন স্বরূপ এক একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পদের পাদটীকায় সেই পদ যে-সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে। পদগুলি রচয়িতাদের নামের অকারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত।

পরিশিষ্ট 'খ'—গ্রন্থের 'খ' পরিশিষ্টে অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রত্যেক কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি কোথাকার লোক, কোন্ কোন্ গ্রন্থ

---

* 'এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মগত জাতিতে মুসলমান'। —রবীন্দ্রনাথ [হারামণি-পৃঃ ।৶০]

তাঁহার রচিত এবং রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদের সংখ্যাই বা কত, তাহাও যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছি। এইস্থলে কবি সম্বন্ধে অন্যত্র যে-সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

পরিশিষ্ট 'গ'—গ্রন্থের 'গ' পরিশিষ্টে, 'ক' পরিশিষ্টে উদ্ধৃত পদসমূহের মধ্যে যেসকল দুরূহ শব্দ আছে, তাহাদের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। শব্দসমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া প্রতি শব্দের পার্শ্বে সেই শব্দ যে পদে আছে, সেই পদজ্ঞাপক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান-কবি-রচিত পদসমূহের মধ্যে অতি সহজভাবেই কয়েকটি আরবী ও ফার্সী শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ-সকল শব্দের অর্থজ্ঞান সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়াই মূলতঃ এই দুরূহ শব্দের সূচী বিন্যস্ত হইল।

পরিশিষ্ট 'ঘ'—গ্রন্থের 'ঘ' পরিশিষ্টে যে-সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি হইতে মুসলমান-কবি-রচিত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই-সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদির জন্য পৃথক্ দুইটি অকারাদি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনায় যে-সকল গ্রন্থাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহাদের এক পৃথক গ্রন্থসূচী বিন্যস্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্কলিত বৈষ্ণব-পদাবলীর একাধিক গ্রন্থে মুসলমান-কবি-রচিত পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে একাধিক মুসলমান কবির পদ স্থান পাইয়াছে। অধুনা সঙ্কলিত পদাবলী-গ্রন্থসমূহের মধ্যে জগবন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী', সতীশচন্দ্র রায় এম-এ-সঙ্কলিত 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী', নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ-সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃত মাধুরী', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা', সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী-সঙ্কলিত 'কীর্ত্তন পদাবলী', দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি-এ-সঙ্কলিত 'বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি', ডাঃ সুকুমার সেন এম্-এ-রচিত 'A History of Brajabuli Literature' প্রভৃতি গ্রন্থে মুসলমান কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উপরি উদ্ধৃত পদসঙ্কলন-গ্রন্থসমূহে মোট সাতজন মুসলমান পদকর্ত্তার পদ স্থান পাইয়াছে। রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে ও ব্রজসুন্দর সান্যাল-সঙ্কলিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের চারি খণ্ডে সর্ব্বসমেত ৪১ জন কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ৪১ জন কবির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাতজন কবির পাঁচজনও আছেন।

অতএব এই সকল গ্রন্থে সর্ব্বসমেত তেতাল্লিশ (৪১+২) জন কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে *।

আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে এতদতিরিক্ত আটাত্তর জন অর্থাৎ সর্ব্বসমেত একশত একুশজন কবির পদ উদ্ধৃত করিয়াছি। এই-সকল কবির মধ্যে কাহারও কাহারও পদ বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে এবং অবশিষ্ট অনেকের পদ বিভিন্ন মুদ্রিত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ১২১ জন কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ছয় শত। বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে প্রত্যেক কবির রচনার নিদর্শনস্বরূপ মাত্র একটি করিয়া পদ উদ্ধৃত করিয়াছি। এই-সকল পদ ও কবি-পরিচয় মাধুকরীবৃত্তি দ্বারাই সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মধ্যে যে-সকল কবির পরিচয় ও পদাবলী মুদ্রিত হইয়াছিল, আমি শুধু সেই-সকল বিক্ষিপ্ত উপকরণ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান কতটুকু এবং তাঁহাদের দানের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটা, তাহা নির্ণয়ে চেষ্টা পাইয়াছি। মুসলমান-কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী সংগ্রহ করিতে যাইয়া এই কথা

---

* নিম্নে এই ৪৩ জন কবির নাম অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হইল এবং প্রত্যেক কবির নামের পার্শ্বে যে-সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইল।

১। আইনদ্দিন—ব্র ৩; ২। আকবর—গৌরপদ তরঙ্গিণী, ব্র ৪, র; ৩। আবদুল আলি—ব্র ৪; ৪। আবাল ফকীর—ব্র ৩; ৫। আমান—ব্র ৪; ৬। আলাওল—ব্র ৩, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস; ৭। আলিমদ্দিন—ব্র ৩; ৮। আলি রাজা ব্র ২; ৯। আলি মিঞা—ব্র ৪; ১০। এবা দোল্লা—ব্র ৩; ১১। ওহাব—ব্র ৪; ১২। কবীর—ব্র ৪; ১৩। কমর আলী—ব্র ৪; ১৪। কালী মীর্জ্জা—ব্র ৩; ১৫। গয়াজ—ব্র ৪; ১৬। গরীব খাঁ—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস; ১৭। চাঁদ কাজী—কীর্ত্তন পদাবলী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস; ১৮। চাম্পাগাজী—ব্র ৪; ১৯। তুলা মিঞা—ব্র ৪; ২০। নশির মামুদ—ব্র ৩; পদ, A Hist, র; ২১। নাছির—ব্র ৩; ২২। নাছিরদ্দিন—ব্র ৩; ২৩। ফএজুল্লা—ব্র ৩; ২৪। ফতন—ব্র ৪, র; ২৫। বক্সাআলি—ব্র ৪; ২৬। বদি উদ্দিন—ব্র ৪; ২৭। ভিখন—ব্র ৪, র; ২৮। মর্ত্তুজা—পদ, কীর্ত্তন পদাবলী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, ব্র ২; ২৯। মর্ত্তুজা—ব্র ২, র; ৩০। মনোহর—ব্র ৪; ৩১। মহম্মদ আলি—ব্র ৪; ৩২। মোছন আলি—ব্র ৩; ৩৩। মোহাম্মদ পীর—ব্র ৪; ৩৪। লাল বেগ—ব্র ৬; ৩৫। সমসের—ব্র ৪; ৩৬। সালবেগ—পদ, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, কীর্ত্তন পদাবলী, ব্র ৪, র; ৩৭। সুলতান—ব্র ৪; ৩৮। সেখলাল—ব্র ৪, র; ৩৯। সের চান্দ—ব্র ৩; ৪০। হবিব—ব্র ৪, র; ৪১। হানিফ—ব্র ৩; ৪২। হাসমত—ব্র ৪; ৪৩। হাসিম—ব্র ৪।

বারবার অনুভব করিয়াছি যে, আমাদের উল্লিখিত সংখ্যার তুলনায় অনুল্লিখিত সংখ্যা অনেক অধিক। বাঙ্গালা সাহিত্যে উৎসাহী কর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করাও আমার এই সঙ্কলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার আধুনিক প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা হইতে অনেক দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা ও পদ সঙ্কলন করিলাম। কলিকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যেসকল গ্রন্থাদি পাওয়া সম্ভব, মফঃস্বলে তাহা পাওয়া দুষ্কর। উপকরণের দিক্ হইতে আমার এই সঙ্কলন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবহুল হওয়ার সম্ভাবনা। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা হইতে মুসলমান-কবি-রচিত বহু সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক আরও বহু গান আবিষ্কৃত হইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের দান বিষয়ে যাঁহারা ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম—'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' রাখিয়াছেন। এইরূপ নাম রাখিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—"কতিপয় মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গাথা রচনা করিয়া বৈষ্ণব-জগতে চির-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল, তাহা অভ্রান্তরূপে জানিতে না পারিলেও তাঁহারা যে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না; এবং এইজন্যই আমরা তাঁহাদিগকে মুসলমান বৈষ্ণব কবি বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইলাম।" রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল-সঙ্কলিত পুস্তিকা প্রকাশের পূর্ব্বে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়-লিখিত একাধিক প্রবন্ধে উল্লিখিত 'অভিধা' পাইতেছি।* আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে এবংবিধ-শিরোনাম-সঙ্কলিত প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথমে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সংখ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-লিখিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়-সঙ্কলিত পুস্তিকা প্রকাশের পর অন্যান্য বহু লেখকের

---

* 'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—'আলো', কার্ত্তিক, ১৩০৬;
'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—'সাহিত্য', ফাল্গুন, ১৩১০।

প্রবন্ধেই ঐ অভিধা গৃহীত হইয়াছে। এমন কি, মুসলমান সমালোচকেরাও ঐ অভিধা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিতে পাই। মুন্সী এক্রামদ্দিন সাহেব 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান কবি' (বীরভূমি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)-শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—"এই সকল মুসলমান কবি প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতা বলিয়া সাহিত্যজগতে বৈষ্ণব কবি নামে খ্যাত ; সুতরাং আমরাও তাঁহাদিগকে উক্ত নামেই অভিহিত করিব।"

বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে যে-সকল কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই বৈষ্ণব ছিলেন কি ?—এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। কবিদের রচিত সকল পদ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সকলে তাহা ছিলেন না। মুসলমান-কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত পদসমূহকে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব-কবিতা ;

(২) রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত, দেহতত্ত্ব-মূলক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রসঙ্গযুক্ত কবিতা ;

(৩) রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত অনাদি-অনন্ত ভগবন্নির্দ্দেশক কবিতা ;

(৪) লৌকিক প্রেমপ্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত কবিতা ;

(৫) বিবিধ।

এই পাঁচ শ্রেণী ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর উল্লেখ করিতে হয়। এই শ্রেণীর কবিতায় রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই। এই কবিতাসমূহকে সাধারণতঃ

(৬) গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কবিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব-কবিতা

বঙ্গীয় মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলি একান্ত বৈষ্ণব কবিতা, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। পণ্ডিত সমালোচক ইচ্ছা করিলে যুক্তিদ্বারা অধিকাংশ কবিতাকেই "রাধাকৃষ্ণ-রূপকে" পরিণত করিতে পারেন। আবার ইহার বিপরীত প্রমাণ করাও তাঁহাদের পক্ষে একান্ত দুরূহ নহে। সমালোচকদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, যে পদটি রাধাকৃষ্ণ-রূপক, তাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-কবিতা হইতে পারে না। আমরা এই মতের

সহিত একমত নহি। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবি-রচিত অল্পবিস্তর প্রায় সকল বৈষ্ণব-পদেরই লীলানুগ লৌকিক ব্যাখ্যা ব্যতীত প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে বলিয়াই এই-সকল পদ বৈষ্ণব-পদ নহে বলিয়া কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাই।* আমার মনে হয় নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পদ-বিচার করিলে একান্ত বৈষ্ণব-কবিতা চিহ্নিত করা অনেকটা সহজ হইবে।

(১) যে-সকল পদে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এবং (২) যাহাতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গে কোন ঐস্লামিক ভাবের ইঙ্গিত নাই। অধিকন্তু যে পদ কবির ভণিতা-অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব-রচিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-পদ ব্যতীত অন্যধর্মাবলম্বীর রচিত পদ বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয় না, সেই-সকল পদই সাধারণতঃ একান্ত বৈষ্ণব-পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে সঙ্কলিত পদসমূহের মধ্যে এমন কয়েকটি পদ পাইতেছি, যেগুলিকে নিঃসঙ্কোচে একান্ত বৈষ্ণব-পদ বলা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ (১) কবীর-রচিত—'বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।' (২৭); (২) কমর আলী-রচিত—'বিরহের জ্বালাএ মরি।' (২৮); (৩) মীর্জ্জা কাঙ্গালী-রচিত—'কিরে শ্যাম্‌ এমন উচিত নহে তোমার।' (৮০); (৪) চাঁদ-কাজী-রচিত—'বাঁশী বাজান জান না।' (৩৯); (৫) তম্না-রচিত—'শ্যাম কানাইয়া আমারে বধিলায় রে জলের ঘাটে নিয়া।' (৪৪); (৬) নশীর মামুদ-রচিত—'ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে।' (৫২); (৭) নাসির মহম্মদ-রচিত—'চলহ সখী নাগরী! মান তুমি পরিহরি।' (৫৬); (৮) মির ফএজোল্লা-রচিত—'রাধামাধব নিকুঞ্জ বনে।' (৭৯); (৯) বুরহানী-রচিত—'শ্যামের চরণে দিব কুলমান সঁপিয়া গো।' (৭১); (১০) মর্ত্তুজা-রচিত—'শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।' (১১২); (১১) মর্ত্তুজা-রচিত—'সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান।' (১১৩); (১২) মন্সুর-রচিত—'আজু সই কি দেখিলুং স্বপনে।' (৭৬); (১৩) মোহাম্মদ আলী-রচিত—'নাগর কানাইয়ারে কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে।' (৮৫); (১৪) মিয়াধন-রচিত—'প্রাণ ললিতা তোরা যাওগো বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা।' (৭৮); (১৫) মোছন আলী-রচিত—'মথুরা বাজারে যাই, পার করি দে নন্দের কানাই।' (৮৩); (১৬) পির মহম্মদ-রচিত—'না যাইলে (যাইমু) মুই মথুরার হাটে।' (৬০); (১৭) লালবেগ-রচিত—'কি করিল সখী

সবে মোরে নিদে জাগাইয়া।' (৯৪) ; (১৮) সালবেগ-রচিত—'বায়ে সখীগণ বিবিধ বাজন।' (১০৪) ; (১৯) শেখলাল-রচিত—'শুনলো সজনী কিছুই না জানি।' (১০০) ; (২০) সেরচান্দ-রচিত—'পন্থ ছাড় ঘরে যাইবে নিলাজ কানাই।' (১০৬) ; (২১) হবিব-রচিত—'দেখ মাই অপরূপ নন্দদুলাল।' (১১৭); (২২) হানিফ-রচিত—'মধুর মুরলী ধ্বনি শুনিতে সুন্দর।' (৮৭) ; প্রভৃতি পদগুলিকে একান্ত বৈষ্ণব-পদ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পণ্ডিত সমালোচক ইচ্ছা করিলে যুক্তিদ্বারা অধিকাংশ বৈষ্ণব-কবিতাকে রাধাকৃষ্ণ-রূপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সৈয়দ মর্ত্তুজা-রচিত একটি পদের যে সমালোচনা মুন্সি এক্রামদ্দিন সাহেব করিয়াছেন, তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

"পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কররে ॥ ধু ॥
ঘাটেরে ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকীদার।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥
হইল হাটের বেলা না হইল বিকাকিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে রাধে গোপালিনী।
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥

এই পদটি স্পষ্টই রাধাকৃষ্ণ-রূপক, ইহা আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। কবি এস্থলে 'পার কর মোরে নাইয়া কানাই,' অর্থাৎ 'কানাই আমাকে নাইয়া অর্থাৎ ভক্তিরূপ নৌকা দ্বারা ভবসিন্ধু পার কর,' ইহাই বুঝাইতেছেন। 'ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই, পন্থের চৌকীদার' কানাই, ভবসিন্ধু পার-অভিলাষী যাত্রীকে ঘাট নির্দ্দেশ করেন, এইজন্যই 'ঘাটের ঘাটিয়াল' এবং ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইলে প্রলোভন হইতে রক্ষা করেন, এই জন্যই 'পন্থের চৌকীদার'।

'নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার'—অর্থাৎ 'আমাকে পার কর, আমি তোমায় জীবনের সারভাগ নব যৌবন দান করিব বা আত্মসমর্পণ করিব'।

'হইল হাটের বেলা না হইল বিকাকিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥'

'মাথার উপরে দিনমণি আইল' অর্থাৎ 'জীবনরূপ দিবসের অর্দ্ধেক গত হইল, তথাপি ভবহাটে 'বিকাকিনি' অর্থাৎ সাধনরূপ কড়িদ্বারা সিদ্ধিরূপ পণ্যদ্রব্য ক্রয়

হইল না'।" ('বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান কবি'—মুন্সী এক্রামদ্দিন লিখিত ; বীরভূমি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩২।)

আমরা এই পদটিকে একান্ত বৈষ্ণব-পদ বলিয়াই মনে করি। এই পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও ইহার যে রাধাকৃষ্ণ-লীলানুগ ব্যাখ্যা অতি সহজভাবে করা যাইতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা 'দান-লীলা'র পদ। এই পদটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে কাহিনীর উল্লেখ আছে, তাহা সংক্ষেপে এই—রাধা মাথায় দধি-দুগ্ধের পসরা লইয়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে মথুরার বাজারে চলিয়াছেন। মধ্যে উত্তালতরঙ্গা যমুনা, কৃষ্ণ সেই যমুনার ঘাটের খেয়া-নৌকার খেয়ানী বা নাবিক হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা দ্বিপ্রহর ; তখন পর্যন্ত বাজারে না যাওয়ায় বিকাকিনি হয় নাই। সেইজন্য রাধা সত্বর নদী পার করিয়া দিতে কৃষ্ণকে অনুরোধ করিতেছেন। 'নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার'—খেয়া পার হওয়ার জন্য কৃষ্ণকে নয়ালি যৌবন-দানের কাহিনী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে বিরল নহে। পূর্ব্বোক্ত সমালোচক 'নাইয়া' অর্থে 'ভক্তিরূপ নৌকা', এরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'নাইয়া' প্রায় সর্ব্বত্রই নাবিক-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—'নদী পার কর বা সুজন নাইয়া' (শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত পল্লীসঙ্গীত)। উক্ত সমালোচক আলোচ্য পদটির ব্যাখ্যা করিয়া ইহা 'রাধাকৃষ্ণ-রূপক, তথা আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে এই পদটি রাধাকৃষ্ণ-রূপক হইলেও ইহাকে একান্ত বৈষ্ণব-পদ বলা যাইতে পারে।

মুসলমান-কবি-রচিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-পদ-সমূহের মধ্যে গোষ্ঠ, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসক-সজ্জা, মিলন, কুঞ্জ-ভঙ্গ, বিরহ, মাথুর, খণ্ডিতা, দানলীলা, কোলি-লীলা, নৌকা-বিলাস, বংশী, দুঃখ-নিবেদন প্রভৃতি-বিষয়ক পদ রহিয়াছে।

এই-সকল কবির মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণলীলা-কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্যামের চরণে শরণ লইয়াছেন। গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ-প্রার্থী নসির মামুদ তদ্রচিত গোষ্ঠলীলার পদের ভণিতায় বলিতেছেন—

'আগম নিগম বেদ সার
লীলায়ে করত গোঠ বিহার
নশীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি।' (৫২)

শ্রীকৃষ্ণ অসময়ে বাঁশী বাজাইয়া রাধারাণীকে আকুল করার কাহিনী উল্লেখ করিয়া চাঁদ কাজী বলিতেছেন—

'চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীম্ না জীম্ না আমি না দেখিলে হরি ॥' (৩৯)

চাঁদ কাজী যেমন হরিকে না দেখিলে বাঁচিবেন না বলিয়া আক্ষেপ করেন, তদ্রূপ আকবরের প্রীতিভাজন আবদর রহিম খানখানা বলেন, "অঞ্জন লাগে নয়নে চোখের বালির মত, সুরমা তো নয়নে দেওয়া যায়ই না। যেই নয়ন দেখিয়াছে শ্রীহরির রূপ, রহিম বার বার সেই নয়নের কাছে আপনাকে দেয় উৎসর্গ করিয়া।"

'অংজন দিয়ো তো কিরকিরী সুরমা দিয়ো ন জায়।
জিন আঁখিন সোঁ হরি লখ্যৌ রহিমন বলি বলি জায় ॥' (দাদ্ পৃঃ ৬৫০)

কবি ইরকান বলিতেছেন—

'দুঃখ সব দিল—নিদয়া কালায়
ভাবিয়া ইরকানে কয় শ্যামের চরণ যেন পাই।' (১৭)

অপর এক কবি 'ব্রহ্মা যারে স্তুতি করে চারি বআনে'—এমন শ্যামরূপ দর্শনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

'মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লীলা।
সামরূপ দরশনে দরবহে শীলা ॥' (৭৯)

কবি সেরচান্দ দানলীলার পদ রচনা করিয়া 'তরিতে পাতকী লোক * * * * কানু বিনে গতি নাহি আর,' এই কথাই প্রচার করিয়াছেন—

'হীন সেরচান্দের বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী
ভজ গিয়া কানু গুণসার।
তরিতে পাতকী লোক না ভাবিও মনে দুখ
কানু বিনে গতি নাহি আর ॥' (১০৬)

ফকির হবিব যে কৃষ্ণের বাঁশীতে 'তিন লোক মোহিত যায়,' তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে নিরবধি দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন—

'ফকির হবিবে বলে কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মোর করে হিয়া কানুরে সম্মুখে থুইয়া
নিরবধি দেখহু সদায় ॥' (১১৭)

কবি হবিব যেমন নিরবধি কাহ্নকে দেখিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব, তদ্রূপ অপর এক কবি ব্যাকুল হইয়া শ্যামকে কাছে ডাকিতেছেন। হিন্দী-ভাষায় মুসলমান কবি আদিল বলিতেছেন—'হে সর্ব্বরূপের ও সর্ব্বগুণের আধার কানাই, তুমি তোমার বাঁশী বাজাইয়া একবার আমার দেহের তাপ উপশম কর। হে নন্দকিশোর, চিত্তচোর, ময়ূরমুকুটধারী, আমার প্রিয় বংশীধর শ্যাম, তুমি একবার এদিকে এস।'

'আদিল স্বজান রূপ গুণকে নিধান কান্হ,
বাঁস্থরী বজায় তন-তপন বুঝাউ রে।
নন্দকে কিসোর চিত-চোর মোর পংথ্যা রে,
বংশীয়ারে সাঁয়রে পিয়ারে ইত আউ রে॥'

ভক্ত কবি লালমামুদ মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এ জীবনে হরেকৃষ্ণ নাম সার করিয়াছেন—

'জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবিনা একবার।
এবার লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার।' (৯৫)

কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—

'হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান।
তোমার পক্ষে সবাই সমান॥
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার॥' (৯৫)

এই পদটিকে একান্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা পদ না বলিয়া, রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত অনাদি-অনন্ত ভগবন্নির্দ্দেশক পদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পদে রাধাকৃষ্ণ-লীলার কোন লৌকিক কাহিনী বর্ণিত না হইলেও কবি এ জীবনে 'হরেকৃষ্ণ' নামই সার করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি যে ঐ লীলায় বিশ্বাসী, তাহা অনুমান করা যায়। যদিও কবি অনুভব করেন—

'কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমায় ডাকে সারাৎসার।'

তবুও মুসলমান কবির পক্ষে খোদা বা আল্লা না বলিয়া 'হরেকৃষ্ণ' বলা অস্বাভাবিক নহে কি? কিন্তু কবি মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কৃষ্ণ-চরণাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করিতেছেন। কৃষ্ণলীলা স্বীকার

না করিলে মুসলমান হইয়া 'শ্রীচরণে' বঞ্চিত, এরূপ কল্পনা মনে আসিতে পারে কি? লাল মামুদের উক্তির সহিত হিন্দী ভাষার মুসলমান মহিলা কবি তাজের উক্তি তুলনীয়। তাজ বলেন—'হে নন্দদুলাল, তোমার অপরূপ রূপমাধুর্য্যের নিকট আমি আত্ম-বলিদান করিলাম। আমি তো মুসলমান, তাহাতে কি, আমি হিন্দু হইয়াই তোমার সেবা করিব।'

'নন্দকে কুমার কুরবান তেরী সুরতপৈ
হোঁ তৌ মুগলানী হিন্দুয়ানী হ্বৈ রহুঁগী মৈ।'

সৈয়দ মর্ত্তুজার বহু পদে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত মনোভাবের চিত্র সুস্পষ্ট।

'সৈয়দ মর্ত্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ॥' (১১৩)

—প্রভৃতি ভণিতায় সৈয়দ মর্ত্তুজা নামের পরিবর্ত্তে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি যে-কোন হিন্দু পদকর্ত্তার নাম সংযুক্ত করিলে ইহা একান্ত বৈষ্ণব-পদ ব্যতীত অন্য কিছু বলা সম্ভবপর হইবে কি? অন্যত্র—

'সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন প্রাণসখি।
এমন বিনোদরূপ কভু নাহি দেখি॥'

অথবা—

'সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন মোর কথা
মন মোর মজি রৈল বাঁশী পুরে যথা॥'

—প্রভৃতি ভণিতায় তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-ভাব-সম্পৃক্ত নহে বলিব কেমন করিয়া? রাধিকা কৃষ্ণের যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধা 'কালা নিল জাতি কুল প্রাণি নিল বাঁশী' বলিয়া আত্মহারা, সেই রূপ কবি তাঁহার মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—'এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি।' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী রাধাকে পাগল করিয়াছে, ঘরছাড়া করিয়াছে। কালার বাঁশীর এহেন কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া কবিও নিজ সম্বিৎ হারাইয়া বলিতেছেন—'মন মোর মজি রৈল বাঁশী পুরে যথা।' 'পদকল্পতরু'তে মর্ত্তুজার যে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে ('শ্যাম বন্ধু চিতনিবারণ তুমি'), তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া 'পদকল্পতরু'-সম্পাদক বৈষ্ণবপদ-রসিক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—'আলোচ্য গীতটিতে পদকর্ত্তা

শ্রীরাধার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া নিজেও তাঁহার হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদ-ছায়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন মনে হয়। কেননা, শুধু ব্রজলীলার কাব্যরসের আকর্ষণে পদ রচনা করিলে তাহা এরূপ আন্তরিকতা-পূর্ণ হয় কিনা, সন্দেহের বিষয়। সুতরাং আলোচ্য পদটি সৈয়দ সাহেবের উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের পরিচায়ক না হইলেও ইহা যে তাঁহার অনন্য কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।' মর্ত্তুজা বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন না হইলে—

'সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥' (১১২)

—প্রভৃতি ভণিতা দেওয়া সম্ভবপর হইত কি? এস্থলে হিন্দী মুসলমান কবি রসখানির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিব। এই কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করিয়া আত্মহারা হইয়া কামনা করেন—'রসখানি' বলিতেছেন, জন্মান্তরে যদি তুমি মানুষ হও, তাহা হইলে ব্রজ-গোকুলে গোপ-দিগের মধ্যে বাস করিও; যদি পশু হও, তবে নন্দের ধেনুর সহিত নিত্য চরিয়া বেড়াইও; যদি পাষাণ হও, তবে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গোবর্দ্ধন-গিরিকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের পাথর হইও; আর যদি পাখী হও তবে যমুনাকূলে কদম্ববৃক্ষের ডালে বাসা বাঁধিয়া থাকিও।

'মানুষ হোঁ তৌ বহি রসখানি, বসৌ ব্রজ গোকুল গায়কে গায়ন।
জো পশু হৌ তৌ কহা বস্ মেরো, চরোঁ নিত নন্দকী ধেনু-মঝারন॥
পাহন হৌ তৌ বহি গিরিকৌ, জো ধর্‌যো করছত্র পুরন্দর-কারন।
জো খগ হৌ তৌ বসরো করৌ মিলি, কালিংদী-কূল-কদম্বকো ডারন॥'

মুসলমান-কবি-রচিত এই জাতীয় পদসমূহ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ প্রাচীন-সাহিত্যরসিক মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বলিয়াছেন—"একদিন এই প্রেমেরই চিত্তহারী সুমধুর সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন-লহরীতে জাত্যভিমান, ধর্ম্মাভিমান, সাম্প্রদায়িকতার স্বাতন্ত্র্য ভাসিয়া গিয়া জগতে এক অভিনব ধর্ম্মস্রোত বহিয়াছিল। কাফের-পীড়ক বিজেতা মুসলমান পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্মাভিমান ভুলিয়া সেই—'সুজন বন্ধু নবঘন শ্যাম প্রাণনাথের' প্রেমধর্ম্ম-কেতনের ছায়ায় আসিয়া শান্তি অন্বেষণ করিয়াছিল। ইহা কম বিস্ময়ের কথা

নহে। যে-সকল মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত সুজন ভাবাবিষ্ট হইয়া পদাবলী রচনা করিতেন।"—এই-সকল কবির মধ্যে কেহ কেহ—"নিজেকে 'হরি রাধার ভক্ত সেবক' * * * * * * * বলিতে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এক্ষেত্রে তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী মুসলমান-ধর্ম্মের অনুশাসনকেও লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।"—('নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি', শাঁলো ১৩০৬, কার্ত্তিক, পৃঃ ১০৮।)

(২) রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত, দেহতত্ত্ব-মূলক জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রসঙ্গযুক্ত কবিতা

বঙ্গীয় মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে এমন কয়েকটি পদ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে দেহতত্ত্বের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক হিসাবে রাধাকৃষ্ণের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এই-সকল পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও ইহাদিগকে বৈষ্ণব-লীলাপদ বলা চলে না। এইজাতীয় পদের নিদর্শন-স্বরূপ—(১) উছমান-রচিত—'মন বাহলে কয় বেভুল সদায়।' (১৯); (২) ওহাব-রচিত—'হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে।' (২৬); (৩) গোলাম হুছন-রচিত—'আবের পতন ঘর খাগের বন্ধন।' (৩৮); (৪) জালাল উদ্দী রচিত—'আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি।' (৪৩); ও (৫) বদিমুদ্দিন-রচিত—'দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ।' (৬৯)—প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই-সকল পদে রাধা ও কানু কোথাও জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে, কোথাও তনু, দেহ, কায়া ও মন, প্রাণ, আত্মারূপে কল্পিত হইয়াছেন। কবি শাহানূর এই মানব-দেহকেই রাধাকানুর মিলন-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'সৈয়দ শাহানূরে কয় রাধাকানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনেরে।'

এই কবি অন্যত্র আরও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—

'তন্ রাধা মন কানু শাহানূরে বলে।'

কবি তন্ ও মনের পরিচয় পাইয়া এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী তনে অর্থাৎ দেহে চিরস্থায়ী মন অর্থাৎ আত্মা বাস করে। ("মন" এইস্থলে "আত্মা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।)

'ছৈয়দ শাহানূরে কয় ভবকূলে আসি,
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী ॥'

এখানে "রাধার মন্দির" বলিতে ক্ষণস্থায়ী দেহকে ও "কানু" বলিতে অনাদি অনন্ত যে আত্মা প্রতি মানুষের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাহানূরের মতে 'তন্ রাধা মন কানু', কোন কোন কবির মতে ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ 'মন রাধা তন্ কানু।' এসব ক্ষেত্রে রাধা কানু প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইলেও বৃষভানুনন্দিনী রাধা ও যশোদানন্দন কানুকে না বুঝাইয়া পৃথক্ বস্তু বুঝাইতেছে। কবি উছ্‌মান বলেন—

'রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন ॥
কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।' (১৯)

প্রাণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মারূপী রাধা দেহরূপী কানুকে পরিত্যাগ করিলে দেহের নাশ হইবেই—'চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।'

বিরাট্ আকাশ যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিঘটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ অনাদি-অনন্ত যে ভগবান্, তিনিও প্রতি মানুষের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন।* এই যে সত্য তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? আমাদের কবি এই সত্যসন্ধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

'রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাও।
তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও ॥' (১৯)

কবি বদিয়ুদ্দিন বলেন—

'এই ঘর আঁন্ধার করি একদিন যাইবা ছাড়ি
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥

* তুলনীয় 'সব ঘটে একৈ আত্‌মা ক্যা হিন্দু মুসমান'—কি হিন্দু কি মুসলমান একই আত্মা সব ঘটে বিরাজমান (দাদূ, পৃঃ ২৮৯); 'সাধো এক আপ সব মাহী—সাধু এক আত্মা সকলের মধ্যে (কবীর, পৃঃ ৬৫); 'সাহব হম মেঁ সাহব তুম মেঁ, জৈসে প্রাণা বীজমে'—স্বামী আমার মধ্যে, স্বামী তোমার মধ্যে, যেমন প্রাণ সকল বীজের মধ্যে (কবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১); 'সব ঘটি একৈ আত্‌মা জানৈ সো নীকা'—সকল ঘটে একই আত্মা, ইহা যে জানে সেই তো উত্তম, (দাদূ, পৃঃ ২৫০)।

তনুর অন্তরে পশি মনুয়া রহিছে বসি
কি রূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিযুদ্দিনে গুরুর আদেশ বিনে
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই॥' (৬৯)

রাধা ও কানু চিনিতে হইলে গুরু বা মুরশিদের শরণাগত হইতে হইবে। অন্যথা ইহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই।

আমাদের বহু কবি এইরূপ দেহ ও দেহীর, গৃহ ও গৃহীর প্রতীকরূপে রাধা ও কানুর উল্লেখ করিয়াছেন। কবি ওহাব বলেন—

'আমি নারী তুমিরে পতি একই গৃহেতে বসতি
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া।'
(রাগমারিফত, পৃঃ ২)

এই ঘরের গৃহীর সন্ধান না পাইয়াই তো ভক্তদের এত কষ্ট। ইহার সন্ধানেই তো মানুষ তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কবীরের বাণীতে পাই—'হে সেবক, আমাকে কোথায় অনুসন্ধান করিতেছ? আমি তোমারই পার্শ্বে রহিয়াছি। আমি কোন মন্দিরে নাই, মস্‌জিদে নাই। কাবা-তীর্থে আমি নাই, কৈলাসে আমি নাই * * *। কবীর কহেন—হে সাধো, আমি সকল নিঃশ্বাসের নিঃশ্বাসের মধ্যে আছি।'

'মো কো কহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ।
না মৈঁ দেয়ল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ॥ * * *
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব শ্বাঁসো কী শ্বাঁস মেঁ॥'
(কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৪)

সেই পরম পুরুষ, যাঁহাকে পরমাত্মা, দেবতা প্রভৃতি যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তিনি—'সব শ্বাঁসো কী শ্বাঁসমে' অবস্থিতি করেন জানিয়াই এই-সকল সত্যদ্রষ্টা কবি ঘোষণা করেন।

'খোদা যদি মসজিদেই করেন বাস, আর সব মুলুক তবে কাহার? তীর্থে মূর্ত্তিতে যদি রাম করেন বাস, বাহির তবে দেখে কে? পূর্ব্বদিকে হরির বাস, পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম। হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ। এইখানেই করীম ও রাম।'

'জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কেহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী বাহর করে কো হেরা॥

পুরব দিশা হরিকো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।
দিলমে খোজি দিলহিমা খোজো ইহৈ করীমা রামা॥'

(কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২-৩)

আমাদের মরমী কবি হাছনরাজা তাঁহার গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও রাধাকৃষ্ণ নামের দ্বারা বৃষভানুকুমারী রাধা ও 'নন্দাত্মজ কৃষ্ণগাতি' ব্যক্তিটিকে না বুঝাইয়া পৃথক্ জিনিষই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'রাধা কানু টাট্টি দিয়া, হাছনরাজা গান যায় গাইয়া।
ভাবিয়া দেখ রাধা কানাই, কে রে হাছনরাজারে॥"

(হাছনউদাস, পৃঃ ৮১)

এই রাধা ও কানাইকে বুঝাইতে যাইয়া কবি বলিতেছেন—

'বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ, শ্যাম রাধার ঘরে করে কাম।
কেহই বলে রাধার কানু, হাছনরাজায় বলে দিলারাম॥ * * *
প্রেমের বাতি জ্বালাইয়া, দেখ তারে নিরখিয়া।
হৃদমন্দিরে বিরাজ করে, হাছনরাজা ধরে নাম॥'

(হাছনউদাস, পৃঃ ৫৯)

জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া শ্যামের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, দেহরূপ রাধাতেই তিনি ক্রীড়ারত। অনেকে তাঁহাকে রাধার কানু বলিয়া, দেহের দেহী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে হৃদয়ের আনন্দ বলিয়াই জানিয়াছি। প্রেমের দীপ জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারি যে, এই হৃদমন্দিরে যিনি বিরাজ করেন, তাঁহারই নামান্তর 'হাছনরাজা'। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

'কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে? রঙ্গের রঙ্গিয়া কানাই।
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে। * * *
হাছনরাজায় জিজ্ঞাস করে কানাই কোন্ জন।
ভাবনা চিন্তা করে দেখি কানাই যে হাছন॥' (হাছনউদাস, পৃঃ ৮৮)

কবি ভাবনাচিন্তা করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, কানাই ও তিনি এক ও অভিন্ন। অন্যত্র— 'আমিই মূল নাগর রে, আসিয়াছি খেইড় খেলিতে,
ভবসাগরে রে।
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব শঙ্করী।
অধরচাঁদ হই আমি, আমি গৌরহরি॥

খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোনজনে আমায় ধরতে পারে॥'

(হাছনউদাস, পৃঃ ৬১)

অন্যত্র— 'একা তুমি বিধাতা, তব সরিক অন্য নাই রে। * * *
বুঝিয়ে দেখি তুমি বই, হাছনরাজা কিছু নই।
হাছনরাজা যারে কই, সেও দেখি তুমি ঐ রে॥'

(হাছনউদাস, পৃঃ ৬৯)

ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় যেরূপ সাধনার স্তরভেদে 'অহং ব্রহ্ম' বলিয়া বিরাট্ ব্রহ্মের সহিত খণ্ড মানুষের একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তদ্রূপ কবি হাছনরাজাও এই অনুভূতির অধিকারী। হাছনরাজার গানে যে 'অহং ব্রহ্ম'-তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই হিন্দীভাষার মুসলমান কবি মংসুরের রচনায়ও পাইতেছি। মংসুর বলেন—'মোল্লা হইও না, ব্রাহ্মণও হইও না, উভয়কে ছাড়িয়া দিয়া আত্মপূজা কর। শাহ কলংদরের হুকুম—তুমি কেবল "সোহহং সোহহং" বলিতে থাক।" পাগল মংসুর বলিতেছেন—আমি আমার হৃদয়মধ্যেই আমার নিজস্ব আত্মতত্ত্ব চিনিয়া লইয়াছি; উহাই সেই ভগবানের সরাবখানা; তুমি যদি নেশা করিতে চাও, ত সেই সরাবখানার ভিতরে চলিয়া এস।'

'ন হো মুল্লা ন হো ব্রহমন, দুঈকো ছোড় কর পুজা।
হুকুম হৈ শাহ কলংদরকা, 'অনলহক্' তু কহাতা জা॥
কহে মংসুর মস্তানা, মৈঁনে হক দিলমেঁ পহচানা,
য়হী মস্তোঁকা ময়খানা, উসীকে বিচ আতা জা॥'

ক্ষুদ্র মানবাত্মাই অবিনশ্বর পরমাত্মার প্রতীক, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কবি হাছনরাজা ঘোষণা করেন—

'মরণ জীয়ন নাইরে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি, এই দেখতে পাই॥'

(হাছনউদাস, পৃঃ ৫২)

তুলনীয়— 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

(গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

'মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়েন।'

কবি আরকুম আত্মার অবিনশ্বরত্ব অনুভব করিয়া বিরাট্ পরমাত্মা কিভাবে ক্ষুদ্র জীবাত্মার মধ্যে ধরা দেন, তাহা এক সুন্দর উপমাদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে।
আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে॥
জমিনে পড়িয়া শেষে সমুদ্রেতে যায়।
জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায়॥
তুমি আমি আমি তুমি জানিয়াছি মনে।
বিচিতে জন্মিয়া গাছ বিচি ধরে কেনে॥
এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি কারণে।'

(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ১২)

সমুদ্রের জলে ও আকাশের মেঘে কোন পার্থক্য নাই। একই জিনিষ সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার বৃষ্টি-আকারে মর্ত্ত্যে পতিত হইয়া জাতের জিনিষ জাতে যাইয়া মেশে, অর্থাৎ জল জলে মিশিয়া যায়। জলকে যে চিনিতে পারে, তাহার নিকট সমুদ্রের জল ও বৃষ্টির জলের মধ্যে যেমন মূলগত কোন পার্থক্যজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ পরমাত্মারূপী তোমাকে যে চিনিতে পারে, তাহার নিকট জীবাত্মারূপ আমার যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে; তখনই বলা সম্ভব হয়—

'তুমি আমি, আমি তুমি জানিয়াছি মনে।'

অন্যত্র— 'তুমি আসিক, তুমি মাসুক, তুমি রাজা প্রজা।
তুমি দেবতা, তুমি ফুল, তুমি কর পূজা॥'

(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৪৫)

অন্যত্র— 'তুমি তুমি, আমি তুমি, তোমার সব লীলা।
তুমি পিঞ্জরা, তুমি সুয়া, তুমি কর খেলা॥'

(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৪৪)

মানুষ যখন 'তুমি'কে চিনিয়া ফেলে, তখন আমি-তুমির পার্থক্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। এমন অবস্থায়—'লোকে যদি বলে তোমার প্রিয়া থাকে কইরে?
আমি বলমু আমার কুলে, তার কুলে মুই রইরে॥'

(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৬)

অথবা—'স্বামীর মাঝে নারীর বেশাত, নারীর মাঝে স্বামী,
তোমার মাঝে আমি মুর্শিদ, আমার মাঝে তুমি ॥'
(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৩১)

কবীর বলেন—'আমার প্রিয়তম আমার মধ্যেই আছেন, আমি কাহার দ্বার ধারি! প্রিয়তম এক পলের জন্য আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, আমিও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহি।'

'হমারা যার হৈ হমমেঁ হমকো ইন্তিজারী ক্যা।
ন পল বিছুড়ে পিয়া হমসে ন হম বিছুড়েঁ পিয়ারেসে॥
(কবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)

তখন এই প্রাণারামকে খুঁজিবার জন্য দেশে দেশে যাইবার প্রয়োজন হয় না। এই প্রাণারাম চিরসঙ্গী জানিয়াই কবি বলেন—

'কেহই কয় মুমিনের দিলে, যাহাকে কলব বলে। * * *
কেহই কয় যার মাসুক যথা, কেহই কয় তুলসী গাছে
আমার জগতের কর্ত্তা। * * *
কেহই কয় মানবলীলা স্ত্রী পুরুষে হইয়া খেলা।
করতে আছে সেই মহাজনে।
কেহই কয় পাইছি তারে না দেখলাম নয়নে।
কোরাণ পুরাণের কথা কখন না হবে মিথ্যা *
সঙ্গে আছে সেই নিরঞ্জন।
তবে কেন দেশে দেশে কর অন্বেষণ'। (আরকুম)
(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৯)

---

* তুলনীয়—(১) "I am He whom I love,
And He whom I love is I.
We are two spirits dwelling one body.
If thou seest me, thou seest Him
And if thou seest Him,
Thou seest us both".
—R. A. Nicholson : *Islamic Mysticism*, p. 80.

(২) "He who knoweth himself knoweth God."
—*Sayings of Muhammad* by Sir A. Suhrawardy, p. 53.
Calcutta, 1938.

যাহাকে বাহিরে খুঁজিতেছি, যে-মুহূর্তে জানিলাম তিনি বাহিরে নহেন, আমার অন্তরে, নিয়ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, তখন হইতে বাহির খোঁজা বন্ধ হইয়া গেল। যখন তাঁহার সন্ধান পাইলাম, তখন আনন্দ দেখে কে? কবি আরকুম চমৎকার এক উপমাদ্বারা এই আনন্দ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'মায়ের শিশুয়ে যদি মায়ের দেখা পায়।
আনন্দিত হইয়া নাচে হাতে আর পায়॥
মুখে হাসে হাতে পুছে দুই নয়নের জল।
ঘড়ি বিচে কান্নাহাসা প্রেমরসের ফল॥'

(হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৮)

পরমাত্মারূপী ভগবান্ প্রতি জীবাত্মার মধ্যে কেন আপনাকে ধরা দেন, তাহার উত্তর দিতে গিয়া এই কবি বলিয়াছেন—

'এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি কারণে।'

প্রেমের জন্য, আপনাকে আস্বাদন করিবার জন্য, এক দুই হইয়াছেন—

'একোঽহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়।' (বৃহদারণ্যক)

একা খেলা জমে না, তাই বহু হইয়া খেলা জমাইতে হইয়াছে।

এই স্থলে বাউল গান পর্য্যায়ের দুইটি পদের উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (১) খলিল-রচিত—'কহিতে দুখ কাটে বুক শ্যামপিরিতের লাঞ্ছনা।' (৩৩) ও (২) সদাই সাহ-রচিত—'আমি করিগো মানা, শ্যামরূপ নিরখি গো, জলে ঢেউ দিও না।' (১০১)—এই পদদ্বয়ে শ্যামের উল্লেখ থাকিলেও শ্যামকে নির্দ্দেশ না করিয়া পৃথক্ বস্তুই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

খলিল বলেন—

'হায়রে অকূল নদীর ভেদ না জেনে কালসাপিনী ছৈও না।
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না।' (৩৩)

সদাই সাহ বলেন—

'নাওয়ের মধ্যে পঞ্চজন একজন কাণ্ডারী গো
আমার তিনজন গুণারী।
মাস্তলেতে পাল চড়াই গো পরাণ সজনী
আমার মনাই ভাই বেপারী॥' (১০১)

—প্রভৃতি উক্তি দ্বারা বাউলদের সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৩) রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত অনাদি অনন্ত ভগবৎ-নির্দ্দেশক কবিতা

বঙ্গীয় মুসলমান-কবিরচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে এমন কয়েকটি পদ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে রাধাকৃষ্ণ নামের দ্বারা ভগবান্‌কে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইজাতীয় পদের নিদর্শনস্বরূপ (১) উম্বররচিত—'আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।' (২১); (২) বেলায়েৎ হোসেন-রচিত —'পীরিতি বিষম জ্বালা।' (৩০); (৩) মতাহির-রচিত—'শ্যাম বন্ধুয়ার আড়ালে ভাইসে উঠি নয়নজলে।' (৭৪); (৪) মুছা-রচিত—'রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয়।' (৮২);—প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই-সকল পদে রাধাকৃষ্ণের ইঙ্গিত থাকিলেও রাধাকৃষ্ণকে না বুঝাইয়া ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে।

কবি হাছনরাজা বলেন—

'আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা,
আমি তোমার কাঙ্গালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে, হাছনরাজা বাঙ্গালী গো॥ * *
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুল্লা মুন্সীয়ে দেয় বাধা॥
হাছনরাজা বলে আমি, না রাখিব জুদা।
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা॥'

(হাছনউদাস, পৃঃ ৬৭)

এই কবির নিকট রাধা ও খোদার মধ্যে কোন 'জুদা' বা পার্থক্য নাই। রাধা খোদার নামান্তর হিসাবেই এই-সকল স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন—

'সোনা রাধে, সোনা রাধে গো!
আমার মন কেনে তোর কাঙ্গালিনী। * * *
শুন শুন এগো রাধা তুমি জগৎ-রাণী।
রাধা বলিয়ে হিন্দুয়ে ডাকে আমি নাহি মানি॥
আল্লা বিনে কিছু নাই আর সব ফানী।
হাছনরাজা ডাকে তোমায় রহিম ও রব্বানী॥

রহিম ও রব্বানী ডাকে আর ডাকে ছুবহানী।
আল্লা আল্লা বলিয়ে ডাকে একবিনে না জানি॥'
[হাছনউদাস, পৃঃ ৮৬]

কবি এথানে রাধাকে রহিম ও রব্বানী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তাঁহার নিকট এক বিনে দুই নাই—'একা তুমি বিধাতা তব সরিক অন্য নাইরে।' এক সরিকবিহীন বিধাতাকেই লোকে নানাভাবে নানা নামে ডাকে। রামকৃষ্ণদেব যেমন সকল ধর্ম্মের সাধনা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিতে পারিয়াছিলেন—জলকে যত ভিন্ন নামে অভিহিত করনা কেন, জল কিন্তু মূলে এক জল; কবীর যেমন হিন্দূ ও মুসলমান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অভিন্ন দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—'রাম-খুদা-শিব-শক্তি এক্কৈ'—রাম ও খোদা, শিব ও শক্তি একই—(কবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২)। কবি মর্ত্তুজা বলেন—'এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' এই মাওলাই 'আপে কানু, আপে রাধা, আপে সে মুরারী।' হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি 'যকরঙ্গ' বলেন—'কেহ বলেন আহম্মদই সেই ভগবান্, কেহ বলেন ঈশাই সেই ঈশ্বর, কেহ বলেন রামই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা। 'যকরঙ্গ' সত্য বিচার করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাকে যিনিই খুঁজিতেছেন তিনিই পাইয়াছেন।'

'কাহু মে আহমদ, কাহু মে ঈশা, কাহু মে রাম কাহায়া রে।
সোচ বিচার কহৈ, যকরংগ পিয়া, জিন ঢুঢা তিন পায়ারে॥'

তুলনীয়—'যে তোমায় যেভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজী।' (রামপ্রসাদ)

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

'তুমি রাধা, তুমি খোদা, তুমি গড্, তুমি অন্নদা।
হরিহর, দিবাকর, কেহ যীশুখৃষ্ট ভণে।' (গোবর্দ্ধন চৌধুরী)

(৪) লৌকিক প্রেম-প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত কবিতা

বঙ্গীয় মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে এমন কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে প্রেমের কথা বলিতে গিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত্ত প্রতীক রাধাকৃষ্ণের নাম করা হইয়াছে। এইজাতীয় গানগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সম্পাদিত 'কীর্ত্তিলতার' ভূমিকায় বলিয়াছেন—'বিদ্যাপতি যেখানে আদিরসের গান লিখিতেছেন, সেইখানেই রাধা ও কৃষ্ণের নাম বেশী। আদিরসের গান লিখিতে গেলেই যেন রাধাকৃষ্ণ আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। এখনও আমাদের দেশে

দেখা যায়, আদিরসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণের নাম করে। একদিন দেখিয়াছিলাম, জনদশেক কয়েদী লইয়া দুইজন 'কনেষ্টবল্' নির্জ্জন রাস্তা দিয়া জেলের দিকে যাইতেছে। পথটা দীর্ঘ, সমস্ত দিন খাটার পর সকলেই একটু স্ফূর্ত্তি চায়। আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে। একজন 'কনেষ্টবল্' একজন কয়েদীকে ডাকিয়া বলিল—'ওরে, এই সুময় তুই একটা গান গা।' সেখানে বাদ্যও নাই, ভাণ্ডও নাই, বাদ্যের মধ্যে তুড়ী। কয়েদী গান ধরিল। আর কয়েদীরাও সেইসঙ্গে গান ধরিল, তাহাদেরও বাজনা তুড়ী। গানটা আমার বেশ মনে আছে, সেটা এই—

আজকে যদি থাক্‌ত আমার শ্যাম,
ধান ভানতে গিয়ে যখন পড়ত মাথার ঘাম,
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত করত কত আরাম।'

এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল, আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালীওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, ঝুমুরওয়ালারাও করিতেন, তরজা-ওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন।' (কীর্ত্তিলতা, পৃঃ ২)

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্য আংশিকভাবে এই-সকল মুসলমান কবির সম্বন্ধেও সত্য। মুসলমান কবিদের মধ্যে মানব-মানবীর প্রেমের কথা বলিতে গিয়া কেহ কেহ প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি রাধাকানুর নাম করিয়াছেন। কারণ, এই বাঙ্গালা দেশে 'কানু বিনা গান নাই'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিটি স্মরণীয়—

'এই প্রেম-গীতিহার,
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

('বৈষ্ণব কবিতা'—রবীন্দ্রনাথ)

এইজাতীয় গানের নিদর্শনস্বরূপ (১) আসরফ-রচিত—'কি দুস আমার রে বন্ধু'

(১৬), (২) ইরপান-রচিত—'দিবানিশি ঝুরে মরি' (১৮) প্রভৃতি পদের উল্লেখ করিতে পারি।

(৫) বিবিধ

বঙ্গীয় মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি পদেক 'বিবিধ'-পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। এই 'বিবিধ'-পদাবলী সংজ্ঞাদ্বারা নিম্নোক্ত একাধিক শ্রেণীর গান নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে এমন কয়েকটি পদ আছে যাহাতে রাধা বা কৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু রাধা বা কৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ঐ-সকল পদে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থলের (যেমন বৃন্দাবন, মধুপুরী) অথবা রাধাকৃষ্ণ-লীলাসহচর-সহচরীদের (যথা—ললিতা, বিশাখা) উল্লেখ পাইতেছি। এইজাতীয় পদের নিদর্শনস্বরূপ বৃন্দাবনের উল্লেখযুক্ত ২১ সংখ্যক * পদ, মধুপুরীর উল্লেখযুক্ত ১০৭ সংখ্যক ‡ পদ, কদম্বতলের উল্লেখযুক্ত ২২ ও ১১০ সংখ্যক ‡ * পদ, ললিতার উল্লেখযুক্ত ২৯ সংখ্যক ‡ ‡ পদের কথা বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে এমন কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে যাহাতে রাধাকৃষ্ণ, তাঁহাদের লীলাস্থল অথবা লীলা-সহচরসহচরীদের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কোন উল্লেখ না থাকিলেও সমগ্র পদটির উপর রাধাকৃষ্ণ-লীলার প্রচ্ছন্ন, কোথাও কোথাও স্পষ্ট, ছাপ রহিয়াছে। এই শ্রেণীর পদের নিদর্শন-স্বরূপ (১) শেখ্ কবির-রচিত—'অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।' (২৮); (২) গয়াজ-রচিত—'পবনাহে গমনেত না করিঅ বাধা।' (৩৫); (৩)

---

* 'করছি মেলা বৃন্দাবন পাইবার আশা দরশন গো।
এগো দেখাইয়া গৌরাঙ্গরূপ বাঞ্ছা পুরাও আমার॥' (২১)

‡ 'আমারে অনাথ করি তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা।' (১০৭)

‡ * 'এবালোমা কহে ধনী ভজ গুরুপদ।
কদম্বতলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ॥' (২২)
'তরুয়া কদম্বতলে ঐ রূপ রঙ্গিমা।
নানারূপ বাঁশীর স্বনে দিতে নারী সীমা॥' (১১০)

‡ ‡ 'তোমরা শুনছনি গো ললিতে
বন্ধে মোরে পাগল কইল পিরীতে॥' (২৯)

চাম্পাগাজী-রচিত—'তুই বন্ধের ছুরতের বলাই লইআ মরি।' (৪১); (৪) তুফানদ্দিন-রচিত—'শুন মাইরে কাহে লাগি এ প্রেম বারাইলা।' (৪৫); (৫) ফতেখান-রচিত—'প্রাণসই কি কহব হামো হতভাগী। (৬৬); (৬) সমসের-রচিত 'ভ্রমে অভাগিনী না চাহিলাম গুণমণি।' (১০২) প্রভৃতি পদ উল্লেখ করা যাইতে পারে। রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল-সঙ্কলিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থল ও লীলা-সহচর-সহচরীদের উল্লেখযুক্ত ও উল্লেখবিহীন উভয়জাতীয় পদই স্থান পাইয়াছে।

'বিবিধ'-পর্য্যায়ে আরও একটি পদের উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা হইতে বিরত হইব। শিতালং-রচিত—'পিরীতের ছেল বুকে যার' (৯৭) পদটিতে রাধাকৃষ্ণের, তাহাদের লীলাস্থল বা লীলাসহচরসহচরীদের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে পিরীতি-জ্ঞাপক নয়টি চিহ্নের—'পিরীতের নয় নিশানি'র কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেক্সপিয়ার (Shakespeare) যেমন 'Seven Ages of Man' কবিতায় মানুষের সাত অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, গোপালঠাকুর যেমন পিরীতির তিন অবস্থার কথা * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই কবিও পিরীতি-পরিচয়-জ্ঞাপক নয়টি চিহ্নের বর্ণনা করিয়া তাহার তিন অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছেন—

'প্রথম কুপীরিতে মজা দ্বিতীয়ে পিরীতে সাজা গো
এ গো তৃতীয়ে পিরীতে রাজা
রঙ্গ খুসী বে সমার।
শিতালং ফকিরে বলে প্রেমের মালা যার গলে গো
এ গো তারা কেওরর কথা নাহি শুনে
কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার।' (৯৭)

---

* তুলনীয়—'পহিলে পিরীতি নয়নের বাণে
প্রেমবীজ জনমিল। * * *
দ্বিতীয় সময় অতি সুখময়
প্রেমতরু অনুপাম। * * *
তৃতীয় সময় প্রকাশ'লো কথা
কলঙ্কে ভরল দেশ' * * *
('গোপাল ঠাকুরের পদাবলী,' পদসংখ্যা ৭৪, পৃঃ ২০)

(৬) গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী

বর্ত্তমান গ্রন্থে বৈষ্ণব-পদাবলী পর্য্যায়ে গৌরলীলা-পদাবলীর স্থানদানের কারণ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রামাণ্য সকল সঙ্কলনেই গৌরলীলা-পদাবলী স্থান পাইয়াছে। এইরূপ স্থান পাওয়ায় বৈষ্ণব-পদাবলী-সঙ্কলয়িতারা যে গৌরলীলা-পদাবলীকেও বৈষ্ণব-পদাবলী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কৃষ্ণলীলা গানের প্রাক্কালে উক্ত লীলার অনুরূপ গৌরলীলার পদ গীত হইয়া থাকে। এই জাতীয় পদ গৌরচন্দ্রিকা নামে অভিহিত। 'বৈষ্ণব-পদাবলী' সংজ্ঞাদ্বারা সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা-পদাবলীই নির্দ্দেশ করা হয় এবং উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা-পদাবলী আস্বাদনের প্রধান সহায়ক হিসাবে গৌরলীলা পদাবলীকেও অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলমান-কবি-রচিত বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদাবলীর মধ্যে গৌরলীলার কয়েকটি পদ আছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম গত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে * যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে নব-কলেবর গ্রহণ করিয়াছে, সেই নদীয়া-নাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু ভক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এইজাতীয় পদাবলীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সঙ্কলন-গ্রন্থ 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'। এই 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে 'আকবর'-ভণিতা-যুক্ত একটি চমৎকার পদ স্থান পাইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবকে যাঁহারা বন্দনা করিয়াছেন, চৈতন্যদেবের প্রতি যাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ব্যতীত আর কি বলিব? কৃষ্ণলীলার পদসমূহকে কোন কোন স্থলে 'জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌরলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপকের বিশেষ অবকাশ নাই। গৌরলীলার পদরচক মুসলমান কবিদিগকে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন না বলিবার মত কোন যুক্তিই পাইতেছি না। (১) আকবর-রচিত—'জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা।' (২৬); (২) গরিব খাঁ-রচিত—'শরমে শরম পেলায়ে গেল।' (৩৬); (৩) লালন-রচিত—'আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।' (২৩) প্রভৃতি পদে চৈতন্যদেবের প্রতি যে অকুণ্ঠ ও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই-সকল গৌরলীলার পদ আনুষ্ঠানিক কীর্ত্তনে

---

* শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা=১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী।

'গৌরচন্দ্রিকা'-রূপে গীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও পদকর্ত্তাগণ গৌরভক্ত-সংজ্ঞার সম্পূর্ণ অধিকারী।

নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃঢ় ধারণা এই যে, দ্বাপরে যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিতে তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন—'নন্দসুত ছিল যেই শচীসুত হৈল সেই।' মুসলমান কবিদের মধ্যেও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ নৈষ্ঠিক মতাবলম্বীর অভাব নাঁই। গরিব খাঁ-রচিত—'শরমে শরম পেলায়ে গেল।

রাই কানু দুটি তনু যামন দুধে জলে ম্যালায়ে গেল ॥' (৩৬)

—গানে চৈতন্য অবতারে রাইকানুর এক হওয়ার কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। *

চৈতন্য-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তাহার অদ্ভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাহারা পণ্ডিত চৈতন্যকে বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাঁহার কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে। যাহারা কীর্ত্তনরত শ্রীচৈতন্যের প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পতুল্য প্রেম-রোমাঞ্চিত কলেবর ও

---

* তুলনীয়— কাঞ্চন গালিয়া কেবা যতন করিয়া গো
তমালের গাছে দিল রঙ্গ। * * * *
উপমা দিবার চাই ত্রিভুবনে নাই গো
আঁখি ভুলে রূপের ঝলকে।
গোপালের রাইকানু কে করিল এক তনু
এমন সন্ধানী ছিল কে? (গোপালঠাকুর)

অথবা— 'প্রেমের লাগি অনুরাগে দাসখতে যে নাম লিখেছে।
সে ঋণদায় হ'তে আদায় সদায় সে যে কাঙ্গে আছে। * * *
গোপাল কয় এই মনে লয় সেই কালাচাঁদ ঐ এসেছে॥' (ঐ)

অথবা— 'জানি কোথা বা ছিল কোন্ রমণীর হৃদয়মণি
দার ঠেকিয়া আইল।' (ঐ)

অথবা— 'এসেছে সে ব্রজের বাঁকা কাল-সখা দেখ্‌বি আয়
তোদেরই এই নদীয়ায়।
তার রং গিয়েছে ঢং গিয়েছে, কালই এখন চিনা দায়
তোদেরই এই নদীয়ায়।' (বিশ্বরূপ)

শিশিরসজল-পদ্ম-কোরকসদৃশ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন একবার দেখিয়াছে, তাহারাই ভুলিয়াছে।

'না খায় না লয় কারো না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তনবিলাস॥' (চৈতন্য-ভাগবত)

এই কীর্ত্তনবিলাসের বন্যায়ই 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' এই কীর্ত্তন ও নর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রোতা ও দর্শকদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সাহা আকবর এই কীর্ত্তন ও নর্ত্তনেই মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

'জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥' (৯৬)

প্রেমপাগল চৈতন্যকে দেখিয়া কবিরও প্রেমাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। তিনি আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—

'ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥' (৯৬)

আর এক কবিও চৈতন্যের শুষ্ক পাণ্ডিত্যের বা তর্কশক্তির কথা না বলিয়া তাঁহার দৈন্যের কথাই সশ্রদ্ধহৃদয়ে উল্লেখ করিতেছেন—

আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা। * * *
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে॥
মরি হায় কি লীলা কলিকালে
বেদবিধি চমৎকারা।' (৯৬)

অপর এক কবি সম্ভবতঃ জগাই মাধাই প্রভৃতির কাহিনী অবগত হইয়া, গৌর অবতারে কত লোহার মানুষ সোনা হইল দেখিয়া গাহিয়াছেন—

'সোনার মানুষ নদে এল রে!
ভক্তসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥ * * *
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নূপুর, সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত ক'রে।
কত লোহার মানুষ সোনা হ'ল গৌর অবতারে॥' (লালমামুদ)

ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট মানুষ চৈতন্য যেমন দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন,

তদ্রূপ একাধিক মুসলমান কবির কবিতায় 'গৌর' নামটি কবির আরাধ্য দেবতার নামভেদ-রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

খতিসা-রচিত—'গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা।
ও তারে বুঝাইলে বুঝে না গো সই জপাইলে জপে না॥ * *
যেই নামে পাষাণ গলে সেই নামে তার অঙ্গ জলে।
এ গো লইবে না সে নামটি মুখে করিয়াছে কল্পনা॥' (৩২)

সৈয়দআলী-রচিত—'গৌর-আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার দরশন।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন॥' (১০৮)

হছন-রচিত— 'গৌরচান্দ আমার!
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥' (১২১)

প্রভৃতি পদে 'গৌর' নামটি কবির আরাধ্য দেবতার নামান্তররূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে।

যে শতাধিক কবির পদাবলী বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পদকর্ত্তাই অধিক অর্থাৎ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী। এই-সকল কবির রচনায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিপুণভাবে ধরা পড়িয়াছে।

'বিনোদ আজু যাও ঘর।
তোমা খাইবে বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার॥
উঠানেতে হাটু পানি সম্মুখে গড়খাই।
সোনাহেন বন্ধুয়া রাখিমু কোন ঠাই॥'

প্রভৃতি বর্ণনায় বৃন্দাবনের চিত্র কতখানি ফুটিয়াছে, তাহা বলিবার অধিকারী আমি নহি। কিন্তু এইরূপ চিত্র যে পূর্ব্ববঙ্গে অহরহ চোখে পড়ে তাহা পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী মাত্রই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের কবি-রচিত পদাবলীসমূহের মধ্যে বঙ্গভূমির খণ্ডচিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই-সকল কবি বাঙ্গালার জাতীয় কবি নামে অভিহিত হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী।

এই-সকল কবির নৈতিক জীবন এত বিশুদ্ধ ছিল যে, তাঁহারা কোনও শ্লীলতার বাঁধ তিলমাত্র অতিক্রম করেন নাই। ইঁহারা সকলেই ভগবৎকৃপার উপর দৃঢ়বিশ্বাসী এবং সংসারের কুনীতি ও হৃদয়হীনতার উপর খড়্গহস্ত

ছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদ লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা পীড়িত হইয়াছেন। কবির ধারণা, কলিকাল বলিয়াই এ-যুগে এমনটি সম্ভব।

'কলি হইল বলীরে ধরম নাই তার মনে।
আপন পর পরিচয় নাহি বিবাদ জনে জনে॥'

(নাছিরদ্দিন)

অথবা— 'কলি হইল বলী ধর্ম্ম নাহি মনে।
বলবুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে॥'

বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান-কবি-রচিত যে একশত দুইটি পদ বর্ত্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাহা কোন্ রাগরাগিণীতে গেয়, তাহার উল্লেখ আছে। এই-সকল পদকর্ত্তার মধ্যে অনেকে সঙ্গীত-রসিক ছিলেন। কানুফকির নামে পরিচিত আলিরাজা তদ্‌রচিত কোন কোন গানে— যে রাগিণীতে তাহা গেয়, সেই রাগিণীর বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়া পদটির গীতি-সৌন্দর্য্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন। 'মল্লার' রাগিণীতে গেয় শ্যামরূপ-বর্ণনামূলক গানে কবি বলিতেছেন—

'শ্যামরূপ শ্যামচন্দ্র শ্যাম অলঙ্কার।
শ্যামমেঘে পুর্ণাসন করিছে মল্লার॥
মাতঙ্গবাহন রাজা স্বর্গের উপর।
মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর॥'

[ঐ ২, পৃঃ ৬]

কবি অন্যত্র 'কেদার'-নামক সুরের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

'পিরীতি-রতন মূলে হীন আলিরাজা বোলে
প্রাণসখা-পদে ব্রত করি।
কেদার হেমন্ত ঘরে বঞ্চে নিত্য প্রিয়েশ্বরে
বসন্ত হইল প্রাণবৈরী॥'

[ঐ ২, পৃঃ ৯]

অনুরূপভাবে 'কানাড়া' সুরের উল্লেখ করিয়া কবি গাহিতেছেন—

'গুরুপদে আলিরাজা গাহিল কানাড়া।
চিত্ত হতে প্রেমানল না হউক ছাড়া॥'

[ঐ ২, পৃঃ ১৭]

যখন প্রেমানলে রাধিকার অন্তর জরজর, তখন কবি 'মাধবী' রাগিণীতে গান গাহিয়া এই অনল নির্ব্বাপণের তথা রাধারাণীকে সান্ত্বনাদানের প্রয়াস পাইয়াছেন।—

'মাধবী পিরীতি বশে আলিরাজা গায়।
যার বাণে তিন লোক মারিয়া জীয়ায়॥'* [ত্র ২, পৃঃ ১০]

এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীত-রচয়িতা মুসলমান কবিদের অনুরূপ কালীসঙ্গীত-রচয়িতা কয়েকজন মুসলমান কবি আছেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা নাথ-সাহিত্যের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস'-রচয়িতা শুকুর মামুদ, 'গোরক্ষবিজয়'-রচয়িতা কবি ফএজুল্লার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রিবেণীর দরাফ খাঁ কর্ত্তৃক সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গঙ্গাস্তোত্র এখনও নৈষ্ঠিক হিন্দুরা গঙ্গাস্নানান্তর পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতীয় সাধনাপ্রণালীদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহু মুসলমান সাধক হিন্দু যোগশাস্ত্র মূলতঃ অনুসরণ করিয়া যোগসাধন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থে আসন, দেহতত্ত্ব ও ষট্‌চক্র প্রভৃতির চিত্র আছে। হিন্দুদের ষট্‌চক্র মুসলমানদের কেহ কেহ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইজাতীয় একাধিক গ্রন্থ পাঞ্জাবে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশেও এই জাতীয় গ্রন্থ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলিরাজা-রচিত 'জ্ঞান সাগর', 'যোগকালন্দর' ও 'ষট্‌চক্র' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই-সকল গ্রন্থের পরিভাষা অনেক স্থলে মুসলমানী হইলেও মূল বিষয়ে হিন্দু যোগাদির সহিত বিশেষ অনৈক্য নাই। এই-সকল গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনাই যেন অনেকখানি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এইসকল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের নিম্নোক্ত মন্তব্য সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। মুন্সী সাহেব বলেন—

'কাফেরবিদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুদের দেবদেবীকে পর্য্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ। ইহা ছাড়া,

---

* নিম্নে বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ক' পরিশিষ্টে উদ্ধৃত গানগুলি যে যে রাগিণীতে গেয়, সেই সেই রাগিণীর বর্ণানুক্রমিক সূচী বিন্যস্ত হইল। প্রতি রাগরাগিণীর নামের পার্শ্বে ঐ রাগরাগিণীতে যে পদ গেয়, সেই পদজ্ঞাপক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আশাবরী—	১১৭	করুণ ভাটিয়াল—	৪১	কানাড়া—	৭৫
আশোয়ারী—	১১৫	কল্যাণ—	৮৭	কাফি—	২৮
আহির পরজ—	৭৬	কাওয়ালী—	৩০	কুহু (কহু ?)—	৬৬

মুসলমান সাহিত্য-সেবীরা হিন্দুদের বিষয়কে তাঁহাদের কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় করিতে কোথাও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আলাওল ও দৌলত কাজীর রচিত গ্রন্থদ্বয় ['পদ্মাবতী' ও 'লোরচন্দ্রাণী'] উহার পোষকতা করিতেছে। * * * মুসলমান কবি হাসিম সাহিত্যের খাতিরে জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া, স্বীয় ধর্ম্মগণ্ডীর সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, হিন্দুর আরাধ্য রাধিকার বারমাস ও অপর একজন নিমাইর বারমাস লিখিয়া গিয়াছেন।'

(পূর্ণিমা, ১৩০৯ আষাঢ়, পৃঃ ৯২)

'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সংক্ষেপে অথচ সার্থকভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে শুধু বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে যে-সকল পীরের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদের উল্লেখ করিব। সত্যপীর, মাণিকপীর, কালুগাজী, বড়খাঁগাজী প্রভৃতির সৃষ্টি এই ধর্ম্মসমন্বয়ের ফলেই হইয়াছিল। এই-সকল পীর হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়ে জাত এই-সকল পীর—

'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর।
দুই কুলে লয় সেবা হইয়া জাহির॥'

(কাব্য-মালঞ্চ, পৃঃ ৩০)

গঙ্গাষ্টক-রচয়িতা মুসলমান কবি দরাফ খাঁ তদানীন্তন যুগের মুসলমানদের নিকট হিন্দু-মনোভাবাপন্ন বলিয়া ধিক্কৃত হন নাই, অধিকন্তু সশ্রদ্ধ অভিনন্দনই লাভ করিয়াছেন।

'ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ্ খান।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান॥'

(অঙ্গনামা,—কাব্য-মালঞ্চ, পৃঃ ৩১।)

সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দ্দেশ

আ—আরবী।

ইং—ইংরাজী।

উ—উর্দু।

তরু—পদকল্পতরু।

তুল—তুলনীয়।

দ্র—দ্রষ্টব্য।

নং—নম্বর।

পং—পংক্তি।

পা—'পাঠমালা', প্রথম খণ্ড, মনসুর উদ্দীন-সম্পাদিত।

পৃঃ—পৃষ্ঠা।

প্রাঃ পুঃ বিঃ—'প্রাচীন পুথির বিবরণ', মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত।

ফা—ফার্সী।

বাং—বাঙ্গালা।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন-গীতিকা'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

ব্র ১—'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', প্রথম খণ্ড, ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত।

ব্র ২— ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ঐ

ব্র ৩— ঐ তৃতীয় খণ্ড ঐ

ব্র ৪— ঐ চতুর্থ খণ্ড ঐ

ভা—'ভারতবর্ষ' (মাসিক পত্রিকা)।

র—'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত।

সং—সংস্করণ অথবা সংখ্যা।

সম্মিলন—'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকা।'

সু সমাচার—'সুবর্ণবণিক সমাচার' পত্রিকা।

হি—হিন্দী।

A Hist.—A History of Brajabuli Literature by Sukumar Sen.

পদ-সংগ্রহ

১। অম্বাণ ধানশি (ভাটিয়াল)—বিবিধ

অগো রাই [সই ?] কি দেখিআ কি শুনিআ তোরা মোরে দোস গো।
মুই ত না জানোঁ কিছু ননদিনী পিছু পিছু
আজু কার বোলে কুবোল বুলি রোস গো॥ ধু॥
সব সখি এক হৈআ মিছা কথা কৈআ কৈআ ব্রজকুলে তোলে মিছা রোল গো।
কারে (?) ভাবে মনে লাজ দিআছে সভার মাঝ
আজু নাগর দিআছে করি কোল গো।
হীন অম্বাণে ভণে এ বচনে রোস কেনে অঙ্গ (?) তোম্বার অপরূপ চিন [গো]।
তরুবাঁশি কদম্বের ফুল ত্রিফিনী জবুনার কুল আজু প্রতি অঙ্গে দাগ ভিন্ন ভিন গো॥

২। আকবর আলী বাউল—(পূর্ব্বরাগ) স্বপ্নদর্শন

আমার প্রাণ কান্দে শ্যাম বন্ধুয়ার লাগিয়া।
নূতন পিরিতে ছেল দিল লাগাইয়া॥ ধুয়া॥
সামকালার পিরিতে মোরে, রইতে না দিল ঘরে।
ও আমার প্রেমজ্বালায় অঙ্গ যায় জ্বলিয়া॥
একা ঘরে শুইয়া থাকি, স্থতিলে স্বপনে দেখি।
ও আমার কর্ম্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া॥
ছাবাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মোর অঙ্গ জ্বলে।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া॥

৩। আছাওদ্দিন বরাড়ি—মিলন

গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল।
বহু আরাধনে শ্যাম দরশনে
দুঃখ দশা দূরে গেল॥ ধুআ॥

---

[১] ভাঃ ১৩২৫, পৌষ, পৃঃ ৭৭। [২] প্রেমে দেওয়ানা, পৃঃ ১৯। [৩] সম্মিলন, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৩ বাং, পৃঃ ১৮২।

আজু হোন্তে জথি গোকুলে বসতি
আকুল ব্যাকুল ছিল।
পহু আগমনে হরিস বাজনে
আনন্দিত হই গেল ॥
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল
ঝুম ঝুম শব্দ উল্লাস।
জঅ জঅ রোল আনন্দ উল্লোল
দশদিশ হইল উল্লাস ॥
আছদ্দিন কহব এ সব উৎসব
রাখ প্রভু চিরদিন।
মন মনোরথ হইল পুর্ণিত
সহাএ (সহায়) সাহা আএনদ্দিন ॥

৪। **আবঝল** রামগরা—খণ্ডিতা

রে সাম বিসেস চাতুরি ছোঁর (ছোড়)!
কপট না কর কৌর ॥ ধুআ ॥
আছিলা কথা এ সাম সুধামএ (সুধাময়)
স্বরূপে কৈঅরে এথা।
হামো পরিহরি কার সনে নিসি
রজনি গোঞাইলা কথা ॥
নিসি উজাগর নআন রাতুল
বআন ঝামর ভেল।
কোন বিদগধি কামকলানিধি
রছ (রস) নিঠুরিআ (?) গেল ॥
অহনিশি জাগি নিদে ডগমগি
নআন ওহার সাখি।
জে হেন চকোর দেখি দিবাকর
উরিতে লবএ পাখী ॥

[৪] ভাঃ ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৮।

সুরঙ্গ অধর কাজলে মলিন
সিন্দুর উজল ভালে।
বিম্বফল পর জে হেন ভ্রমর
সুর সোভে ঘন মালে॥
আবঝলে কহে ধনি দআমএ (দয়াময়)
ওজুগ জিবন সার।
হেন গুণনিধি চাহ (চাহে ?) নাকি আখি
আপে আপ দেখিবার॥

৫। আবদুল বারী বিরহ

তোরে মিনয় করি, চরণ ধরি, বৈলা দে গো রাই,
হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই।
আমি কি করিব, কোথায় যাব, হারা হয়েছি কানাই॥
পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, জিজ্ঞাসা করি কানাইর কথা গো,
ওগো কেও বলে না মনের কথা, কৈ গেলে প্রাণ জুড়াই।
যার কাছে বসিয়ে কাঁদি, সে হৈয়া যায় আমার যদি গো,
বুঝি কপালে লেখেছে বিধি, খণ্ডাইবার উপায় নাই।
দুঃখ লগ্নে জন্ম আমার, দুঃখের নাহি পারাপার গো,
ওগো কে ঘুচাবে দুঃখ আমার, কি দিয়ে মন বুঝাই।
কি দোষ দিব বিধাতারে, সকলি কপালে করে গো,
ওগো আবদুল বারী কর্ম্মফেরে, কান্দিয়া কাল কাটাই।

৬। আবদুল মালী বাউল

রাগ ভাঙ্কা

পরান বেদনি সই
জনম বিফলে গেল বৈয়া। ॥ ধু॥
রস নিলা ব'স নিলা রূপ নিলা হরি।
মিছা মিছি মায়া জালে বন্দী হৈয়া মরি॥

[৫] আবেগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩। [৬] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৩৩৩, পৃঃ ১৩২।

না চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জনা।
এ তন ভেদিয়া দেখ কেহ নহে আপনা ॥
দুঃখ নিবারণ বাণী কহে আবদুল মালী।
বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈলে খালি ॥

৭। আবদুল মালীক

বিরহ

বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধু
কইও গিয়া শ্যামচান্দের লাগাল পাইলে ॥
আমায় আশা দিয়া আইনে কুঞ্জে কেন সে চইলে গেল
ও আমার কি দোষ দেখিয়া শ্যাম পায়েতে দলিলে ॥
সকাল থেকে বসে বসে এবে সাঁঝ হইয়ে আসে
চারিদিক হইল ঘোর অন্ধকার চোখে কিছু না ভাসে,
ওরে তবু না আইল শ্যাম আর ফিরে দেখা না দিলে
এই দুঃখ মোর বলব কারে ভাসি আঁখির জলে।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু তোর পরাণ এত পাষাণ
ওরে প্রেম পিঞ্জিরে পুইরে, দুহাতে
বাঁধিয়ে রাখতাম তোর গলে
আমার কিসে যে কি হইল হায়রে (মোর)
এই ছিল কপালে।

৮। আবাল ফকির

বড়ারি—বংশী

মুরড়ি আনিআ দে রাধা মোরে ;
(শ্যামের) মুরড়ি আনিআ দে মোরে। ধু।
ঠিক দুপুরিয়া বেলা, কদমতলে নিদ্রা গেলা,
মুরড়ি লই গেল করে।
নিদ্রার আলসে রাই, ঘুমেতে চৈতন্য নাই,
মুরড়ি লই গেল চোরে ॥

---

[৭] প্রেমের দেওয়ানা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
[৮] ঐ ৩, পৃঃ ২৭।

হাত লাড়ালাড়ি বাহু ঝাড়াঝাড়ি,
একলা পাইয়াছ মোরে।
তোমার মুরড়ি, আমি যদি নিআ থাকি,
অই সাইদ বোলাইবা কারে॥
আবাল ভাগিনা, না চাও রে আঙ্গিনা,
ধুলে লোটাই (আ) কান্দে। (?)
আবালে ভাগিনা দেখি, কোলে লইলুম,
সেই মোরে কুবোল বোলে॥ (?)
রাধিকা কানাইআ, জল পরীক্ষিতে,
কানাইআ নামিল আগে।
আবাল ফকিরে কহে, এই বাক্য মন্দ নহে,
রাধিকারে বড় দয়া লাগে॥

৯। **আবুল হুছন** রাগ বাউল, তুপদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ

নবীন কালিয়ার রূপ দেখ গো আসিয়া।
দেখ গো আসিয়া সখি দেখ গো আসিয়া॥
গেছিলাম যমুনার জলে কলসী লইয়া।
দু নয়ান জলে নিল আমার কলসী ভাসাইয়া॥
যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া।
ঐ বন্দের চরণে দিব কুল মান সপিয়া॥
আবুল হুছনে বলে সে রূপ না পাইয়া।
নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়া॥

১০। **আমান** বিরহ

* * *

কে মিলাইবো, কে মিলাইবো,
কে মিলাব কান?
ঘটে না রহে পরাণ॥
কি জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল
কি জানি করমে (আছে?) কি।

[৯] পিরিতের ঢেউ, পৃঃ ৩। [১০] ব্র ৪, পৃঃ ২৬।

কি না দোষে কালা, দিলা এথ জালা,
প্রাণি লৈয়া যাএ তেজি ॥
কি জানি এমন, কালা নিদারুণ,
ভুলি (আ) রহল দূর দেশ।
অনঙ্গ-বেদন, মদন-দহন,
অঙ্গ ছাড়ি প্রাণ শেষ ॥
এই চান্দ চন্দন, শীতল মঙ্গল,
আনন ভাবিয়ে অঙ্গ।
হীন আমানে ভণে, এ তিন ভুবনে,
দেখ কানাই তোহ্মার সঙ্গ ॥

১১। **আরকুম** গান হকিকত দুপাদি—বিরহ

আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে ॥ ধুয়া ॥
মোমের বাতি, সারা রাত্রি, যেড় পালঙ্গে জ্বলে,
দয়া গুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কোলে।
চুয়া চন্দন, করিয়া যতন, রাখিয়াছি বোতলে,
গাথিয়া বনফুলের মালা দিতাম তোমার গলে।
আরসি পড়সি লোক, প্রভাতে জাগিলে,
ছাপাইয়া রাখিমু বন্ধু নিরালা মহলে।
পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে,
না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ॥

১২। **আলাওল** তুড়ী (মতান্তরে ভৈরব রাগ)—অভিসার

ননদিনী রস-বিনোদিনী,
ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধু।
ঘরের ঘরিনী, জগত-মোহিনী,
প্রত্যুষে যমুনাএ গেলি।

---

[১১] হকিকতে সিতারা, পৃঃ ৫২ [১২] ত্র ৩, পৃঃ ১ ; আলো, ১৩০৭ আষাঢ়, পৃঃ ১২৯ ; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, পৃঃ ১২৪ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ২৫।

বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ,
কিসে বিলম্ব করিলি ?
প্রত্যুষে বেহানে, কমল দেখিয়া,
পুষ্প তুলিবারে গেলুম ।
বেলা উদনে কমল মুদনে,
ভোমরা দংশনে মৈলুম্ ॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে,
করের কঙ্কণ গেল ।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
শীষের সিন্দূর, নয়ানের কাজল,
সব ভাসি গেল জলে ।
হের দেখ মোর, অঙ্গ জর জর,
দারুনি পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী, কুলের নিছনি,
কুলে নাই তোর সীমা ।
আরতি মাগনে আলাওলে ভণে,
জগত-মোহিনী রামা ॥

১৩। আলিমদ্দিন

মাথুর

* * *

এই মোর কপালে ছিল,
প্রাণের নাথ ছাড়ি গেল,
সখী লই যাব মথুরাতে ।
মথুরাতে প্রাণধন,
চল চল সখীগণ,
ছাড়ি গেল সখা প্রাণনাথে ॥

---

[১৩] ব্র ৩, পৃঃ ২৯ ; ভাঃ ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৮ ।

হাহা প্রভু দীননাথ,
তুমি বিনে পরমাদ,
তুমি বিনে আঁধার বৃন্দাবন।
শ্রীআলিমদ্দিনে কহে,
শুন রাধে মহাশয়ে,
কৃষ্ণ সাথে হৈব দরশন ॥

১৪। **আলিরাজা।** গুর্জ্জরী—বিরহ

শুন সখি সার কথা মোর।
কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥
সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম।
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য্য কাম ॥
মোর জীউ সে কি মতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেমধরে।
প্রেম পেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

১৫। **আলী মিঞা।** শ্রীরাধার রূপ

* * *

ছোট না রাধিকা, ভরণ কলসী,
মাঝা হেলি চলি পড়ে।
কোন্ নাগরে, পাঠাইছে তোমারে,
দয়া নাই শ্যামের মনে ॥
গাছের উপরে, লতার বসতি,
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে,
কানুএ মজাইল ঐ জাতিকুল ॥

---

[১৪] ব্র ২, পৃঃ ৭। [১৫] ব্র ৩, পৃঃ ২৩।

সঙ্গে সখীগণ, কৈল পলায়ন,
একাকী চলিলাম যমুনা।
যমুনাতে গেলাম, বলাকা দেখিলুম,
আশ্চর্য্য হইল মোর মন ॥
নদীর কিনারে, বলাকা চরে,
মৎস্য চুনি চুনি খায়।
কোন্ নাগরে, পাঠাইছে তোমারে,
জলের নীচে ছায়া দেখা যায় ॥
ছায়া নিরখিলুম, ভাবে মগ্ন হৈলুম,
উদাস হইল মোর মন।
মুই যদি পাইতুম্, যতনে রাখিতুম্,
যামিনী কাটিতুম্ রসে।
সঙ্গে সখী দিতুম্, সম্মানে রাখিতুম্,
দিবা কাটিত নানা সুখে।
আলী মিঞার বাণী, শুন শুন ধনি,
ছাড়িয়া নদীর কূল সঙ্গে যাইবা নি ॥

১৬। আসরফ 	বিরহ

কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ আমার।
মনের কপট ভাঙ্গিয়া বল ফিরিয়া চাও একবার ॥
রে বন্ধু কি দোষ আমার। ॥ ধুয়া ॥
কোন দেশে গেলায় বন্ধু ভুলিয়া রইলায় মোরে।
নিরবধি ঝুরিয়া মরি বসিয়া একাসরে ॥
রাত দিন চাইয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া।
আইতা আইতা সোনা বন্ধু মুররী বাজাইয়া ॥
নিরবধি ডাকি রে বন্ধু উদ্দেশ নাই পাই।
আমি অনাথী করম দোষী আমার করমে ছাই ॥

[১৬] সমছুল ইছলাম আসিকে বারাম, পৃঃ ৪২।

চরণ বাড়াইয়া দেও ধরি একবার।
মনের দুঃখ পানি হইয়া যাউক সমন্দুর মাঝার॥
দেখা দিয়া না দেও দেখা একি বিষম জ্বালা।
ঘরের বৈরী যৌবনপতি বাইরে চিকণকালা॥
অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী।
বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি॥

১৭। **ইরকান** বিরহ

আমি কি দিয়া তুষিমু শ্যামের মন গো
রাই আমার সে ধন নাই।
অরণ্যে বৃন্দাবনে, ঐ শ্যামের কারণে,
বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়াই ;
জাতি কুল মান জীবন যৌবন
দিয়ে শ্যামের মন নাই পাই।
রূপ গুণ যশঃ তোর লাগি সুখাইলাম কায়,
লোকে আমায় বলে কলঙ্কিনী রাই।
দুঃখ সুখ সব দিল নিদয়া কালায়,
ভাবিয়া ইরকানে কয় শ্যামের চরণ যেন পাই।

১৮। **ইরফান** বিরহ

দিবা নিশি ঝুরে মরি বন্ধু বিনে রইতে নারি
বল সখি উপায় কি করি॥ ধু॥
সখি গো বন্ধু বিনে এ দেহের নাহি কেহ সহকারী।
ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদাই করি ইস্তিজারী॥
আর ইস্তিজারী করিতে আমি দুঃখে ভাসি ফিরি।
পাইলে বন্ধুয়ারে আমি রাখিতাম চরণে ধরি॥
ছাবালসা ইরফানে কইল বন্ধু আমার বংশীধারী।
ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরি॥

---

[১৭] রাগ বাউল, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭। [১৮] মারীফতি উদাস বাউল, ১১নং পদ।

১৯। **উছমান** রাগবাউল—দেহতত্ত্ব

মন বাহুলে কয় বেভুল সদায়।
এরূপ যৌবনে দেখা হয় কি না হয়॥ ধু॥
সদায় পাগেলা মন রে বাহুলের মতি।
কানুর সঙ্গে বিবাদ করি ঘটাইলায় দুর্গতি॥
রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন॥
সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তুণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে জল ঢালে সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া॥

২০। **উদাসী** দেহতত্ত্ব

মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ পাতি দোকান।
আশা নি পুরাইবায় আমার অয় গো কালাচান॥
কালা কালা নব কালা কালা তিরভুবন।
কালা গো কাজ্জলির লেখা জালালি রূশন॥
কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান।
প্রেমের গোড়া, আঙ্গার কালা, কালা গো কালাম॥
চৌখের পুতুলা কালা আর যে আছমান।
উদাসীয়ার অঙ্গ কালা না পাইয়া তোমার নিশান॥

২১। **উন্মর** রাগ ধামালি চৌচল্লি—বাউল

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।
প্রেম সায়রে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাঁতার॥

---

[১৯] হকিকতে মারিফত, পৃঃ ১৩।
[২০] বাংলার শক্তি, ১৩৪৭, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃঃ ৩১৯।

যদি ডুবে আমার তরি কিবা আমি ডুবিয়া মরি গো ।
এগো রইবে কলঙ্কের খুটা নামেতে তোমার ॥
করছি মেলা বৃন্দাবন পাইবার আশা দরশন গো ।
এগো দেখাইয়া গৌরাঙ্গ রূপ বাঞ্ছা পুরাইও আমার ॥
কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ পায় ঘরে বসি গো ।
এগো আমার ভাগ্যে না হইল প্রেমের বেহার ॥
উম্মর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো।
এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মোরে কর পার ॥
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ॥

২২। এবাদোল্লা

কোড়া—বিরহ

সহন না যাএ দুঃখ, সহন না যাএ ।
যৌবন চলিয়া গেলে পিয়া না বোলাএ ॥ ধু ॥
সব নারী পিয়া সনে করে আনন্দিত ।
আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত ॥
বদন (বেদন ?) হুতাশে দহে কিবা রাত্রদিন ।
হেরিতে পিয়ার পন্থ আঁখি হৈল ক্ষীণ ॥
আজু কালুকা করি দিন গেল বইয়া ।
না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া ॥
এবাদোল্লা কহে ধনী ভজ গুরুপদ ।
কদম্বতলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ ॥

২৩। এর্শাদুল্লাহ

দেহতত্ত্ব

কৈলে বঁধুর কথা কৈও
গাইলে শ্যামের গীত গাইও, মনুরা ভাই ।
বেদ অংশ দিয়া এ ঘর বান্ধিয়া
তাতে খেলে ঘরের গৃহী।

[২১] এস্কের বাগান, পৃঃ ২৪। [২২] ঐ ৩, পৃঃ ২৬ ; ভাঃ ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৮।
[২৩] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ নং ১২৭, পৃঃ ৭৩।

হৃদের অন্তরে যেই পক্ক-বাজারে
বাজে রাজধ্বনি শ্রী।
মন সদাগরে যেই পক্ক-বাজারে
নিত্য কিনে রাজধ্বনি।
তেজি ভব মায়া চিন নিজ কায়া
গুরু কাছে তত্ত্ব জানি।
উপরে সুড়া তাতে সপ্ত দ্বার
বেদ দ্বারে স্বরধ্বনি।
দক্ষিণ উত্তরে এ যুগ দুয়ার 'পরে
বাজায় বংশী শুনি।
যত মুনি ঋষি নিত্য বাজায় বাঁশি
আপে গুরু সূক্ষ্ম ধ্যানী।
তত্ত্ব পন্থ সার বংশী বিনে আর
নাহি জানে শুদ্ধ জ্ঞানী।
আলি রজা গুরুপদে এর্শাতুল্লাহ ভণে
নিত্য লীলা-দাঁড় বাইও
ভাটি আর উজানি সঙ্গে নৌকাখানি
সদায় পরম নাম লইও।

২৪। ওয়াহিদ — বিরহ

জলিল জলিল জলিয়া উঠিল প্রেমেরি আগুনী লেগেছে গায়।
জলিল অঙ্গ জলিল প্রত্যঙ্গ, জলে পুড়ে সাঙ্গ হায় হায় হায়॥
হৃদয় জলিয়া হয়েছে আলীয়া প্রাণনাথ কালিয়া রহিল কোথায়।
ডাকি বারে বারে না চাহিল ফিরে, কঠিন কি হয় রে হৃদয় তার॥
ধারে নাহি আসে কাছে নাহি বাসে ভাল নাহি বাসে সে গো আমায়।
বন্ধু সামরায়, যার পানে চায়, তার মন কাড়িয়া নিল চক্ষের ইসারায়॥
ওয়াহিদেরি পানে চাহে আড় নয়নে না জানি কি মনে তাও তো বুঝা দায়॥

---

[২৪] তত্ত্বকুলিয়া প্রেমের মিঠাই, পৃঃ ১৯।

২৫। ওহাব ॥ (ক) কুঞ্জভঙ্গ

নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু
নিশি হৈল শেষ ॥ ধু ॥
রাত্রি পোসাইয়া যায়, কোকিলে পঞ্চম গায়,
নিদ্রাতে পাইআছে বড় সুখ।
অভাগিনী বসিয়া রে, নিশি গোঞাইলুম,
উঠ এবে দেখি চান্দমুখ ॥
আমার মাথাটি খাও, উঠ এবে ঘরে যাও,
কাকুতি করিয়া বোলি তোরে।
রাত্রি প্রত্যুষ হৈলে, লোকে দেখিব তোরে,
কলঙ্কিনী করিব আমারে ॥
কলঙ্ক রাখিলে মোর, ভাল না হইব তোর,
মোর রৈব জনমের খোটা।
আমি নারী অভাগিনী, এই দুঃখে দহে প্রাণি,
ননদিনী হৈল মোর কাঁটা ॥
* * *
ফকির ওহাবে কয়, প্রাণি দিবার মনে লয়,
তিলেক না দেখি চান্দমুখ ॥

২৬। ওহাব ॥ (খ) দেহতত্ত্ব

হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে,
হায় রে বন্ধু, অনাথের নাথ, হায় রে বন্ধু তুমি বিনে কে আছে আমার।
বন্ধুরে তোরই সনে প্রেম করি মুই হইলু লোকের বৈরী,
জগতে রহিয়া গেল মোর খুটা।
আউলাইয়া মাথার কেশ মুই হইলু পাগলের বেশ,
যথায় তথায় যাইমুরে চলিয়া।
বন্ধুরে হায়রে কঠিন বন্ধু কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া রে।

[২৫] র ৩, পৃঃ ২৯। [২৬] রাগ মারিফত, পৃঃ ২

আমি নারী তুমি রে পতি　　একই গৃহে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া।
আবদুল কাদিরের বালক　　ত্রিজগতে নাই লখ্‌
রহিলু কেবল মুর্শিদের দিকে চাইয়া।
ফকির ওহাবে কয়　　এই শেল খসিবার নয়,
এই শেল খসিব ওহাব মইলে।

২৭। কবীর　　বসন্ত—হোলী-লীলা

বরজ-কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন,　　আবীর গোলাব,
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥ ধু॥
ফাগু হাতে করি,　　ফিরত শ্রীহরি,
ফিরি ফিরি বোলত রাই।
ঘুমট উঠায়ে,　　বয়ান ছাপায়ত,
বৈরি বৈরি যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই॥
ললিতা একা সখী,　　ফাগু হাতে করি,
দেয়ত কাহ্নু নয়ান।
বৃকভানু কিশোরী,　　দুহুঁ বাহু ধরি,
মারত শ্যাম বয়ান॥
আওর একসখী　　জীউ জীউ করি,
কাঁহা লাগাও আবীর।
কমরি ফাগু লেই, কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত,
হা হা করত কবীর॥

২৮। **কমর আলি**　　কাফি—মাথুর

বিরহের জ্বালাএ মরি।
কোথাএ গেল প্রাণের হরি। ধু।
বাঁকা রূপ কালিন্দীর কূলে,　　দেখি না কদম্বতলে,
আরত বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকে না রাধা প্যারি॥

---

[২৭] ব্র ৪, পৃঃ ৩৮; র, পৃঃ ৮; গু-সমাচার, পৃঃ ৩০৭; পা, নং ৬; কাবামালক পৃঃ ৭৩।
[২৮] ব্র ৪, পৃঃ ১৩।

শয়নে স্বপনে দেখি, জাগে [জাগনে] কান্দিয়া থাকি,
সব শূন্য বৃন্দাবন আইসে না বংশীধারী।
হীন কমর আলি ভণে, ভাব্যনা প্যারি তোর মনে,
আসিব তোর প্রাণের হরি দেইখবা তুই নয়ান ভরি ॥

২৯। কালা শা বিরহ

তোমরা শুনছনি গো ললিতে,
বন্ধে মোরে পাগল কৈল পিরিতে ॥
(হায়রে) কইরা পিরিতি ছাড়িয়া গেল গো সই।
আমি পারি না গো সহিতে
বন্ধু আমার নিরধনিয়ার ধন।
বন্ধুর ভাবে জীবন গেল কি করি এখন ॥
(হায়রে) কইতে নারি সইতে নারি গো সই
সে যে ভুলাইল কি মতে ॥
বন্ধু আমার নয়ানের তারা
দেখলে সে প্রাণে বাছি না দেখলে মরা
(হায়রে) নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু গো সই
আমায় কি ছেল মাইল বুকেতে ॥
অধম কালা শায় বলে—
বন্ধু আমার রসের নাগড় পাইমু কৈ গেলে
পাইতাম যদি ধরতাম গলে গো সই
প্রাণ বন্ধু দিতাম না গো যাইতে ॥

৩০। কালীপ্রসন্ন অর্থাৎ মুন্সী বোলায়েৎ হোসেন

বেহাগ (কাওয়ালী)—বাউল

পীরিতি বিষম জ্বালা পীরিতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে যত এর লীলাখেলা ॥
যে মজে যাহারই ভাবে অবশ্য সে তারে পাবে।
স্বর্গ নরক দুই ভবে চিনে লও এই বেলা ॥

---

[২৯] রত্নসাগর, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৭। [৩০] বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৯২৩।

যে ডুবেছে প্রেম সাগরে সে সকল বলিতে পারে।
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত সুখ কত জ্বালা ॥
প্রেম কি গাছের ফল পাড়িবে করিয়া বল।
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে।
চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর লীলাখেলা ॥

৩১। কাসিম প্রভাত বিরহ

অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে
অরে কার ভরে কার ভয়ে বোলাই না গেলা রে ॥ ধু
একেলা মন্দিরে বসি জপি বন্ধু বন্ধু।
দেখাদি পালাই গেলা যেন নব ইন্দু ॥
একেত আন্ধার রাত্রি কেহ নাই সাথী।
কি রূপে হাটিয়া গেলা নিশিভাগ রাতি ॥
মথুরার হাটে আমি পাইলুঁ খবর।
ত্রিবেণীর ঘাট দিয়া পার হৈলা এক নর ॥
ত্রিমোহানী ত্রিবেনী ঢেউ প্রতিনিত।
কেমনে হইলা পার না বুঝি চরিত ॥
দিন লাহুতেত ডুবি ডুবি কৈলুঁ সার।
কিসকে নিমায়া হইয়া তেজিলা আমার ॥
এতিম কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি।
তুঞি বন্ধুর বিচ্ছেদ খেদে ঝুরি ঝুরি মরি ॥

৩২। খতিশ বাউল

গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা।
ও তারে বুঝাইলে বোঝে না গো সই জপাইলে জপে না ॥
বলছে মোরে কানে কানে, সে জপতে পারে সে নাম বিনে।
এ গো এখনে বুঝিলু তারে কালভূজঙ্গের ছানা ॥

[৩১] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ নং ২৩৪, পৃঃ ১০৮। [৩২] আসিক নামা, পৃঃ ১১।

যেই নামে পাষাণ গলে, সেই নামে তার অঙ্গ জ্বলে।
এ গো লইবে না সেই নামটি মুখে করিয়াছে কল্পনা॥
রাখ্ মানে না থাক্ মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে না।
এ গো যাদু টুনা কৈরে চাইলাম আছর করে না॥
দুর্ম্মতির গণ্ডকুলে অধম খতিসা বলে।
এ গো ঘটিল লাঞ্ছনা সই গো ঘটিল লাঞ্ছনা॥

৩৩। খলিল

বাউল

কহিতে দুঃখ ফাটে বুক শ্যাম পিরিতের লাঞ্ছনা,
সই গো পিরিতে আমায় চাইল না।
সখি গো জলের সনে কাষ্ঠের পিরিত জলে ভাসে দুইজনা।
জলের সনে মীনের পিরিত জল ছাড়া মীন বাঁচে না।
সখী গো অগ্নির সনে করতাম পিরিত মনে ছিল বাসনা,
হায়রে অকুল নদীর ভেদ না জানে কালসর্পিনী ছুও না।
সখী গো অধম খলিলে বলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না।

৩৪। খাতা শা'

বিরহ

সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যন্ত্রণা—
সই গো তার উপায় বল না,
জলিয়াছে বিচ্ছেদের অগ্নি জল দিলে সে নিভে না।
বন্ধু রে এই আশা ছিল মনে, সুখী হইব দুই জনে,
সেই আশায় নৈরাশ কৈল কেনে ;
মনের আশা মনে রইল কেন বন্ধু আইল না।
বন্ধু রে মনোসাধে প্রেম করিয়া, আছি পথপানে চাহিয়া,
কেন বন্ধু দয়া নাই তোর মনে ;
আমার মনের আশা মনে রইল, পুর্ণ বুঝি হৈল না।

[৩৩] রাগ মারিফত ১ম ভাগ, পৃঃ ৮।
[৩৪] রাগ-মারিফত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪।

আমিত অবলা নারী তোমার জন্ম কেন্দে মরি,
দুঃখে দুঃখে গেল চিরদিন ;
আইল না শ্যাম কালিয়া, সদায় করি ভাবনা।
বিধি সে দারুণ হয়ে, পরের অধীন বানাইয়ে,
জন্ম দিল আমি দুঃখিনীরে ;
খাতা শা ফকিরে কয় সখী গুরু কেন ভজ না ?

৩৫। গয়াজ পাহিড়া—বিরহ

পবনা হে গমনেত না করিঅ বাধা।
পহুরে কহিয় দুঃখ, বিদেশে কেমন সুখ,
নারী বধে তেজ্ঞি ভেল সাধা ॥ ধু ॥
কনক অঙ্গুরী ছিল, সে পুনি বলয়া ভেল,
সে বলয়া হৈআ গেল তাড়।
প্রভুরে কি দিমু গালি, যদি না আইসে আজি কালি,
পরাধীনী জীবন আন্ধার ॥
যদি প্রিয়া আইসে কালি, প্রিয়াকে পাড়িমু গালি,
প্রথম দিনে হইলুম নিপাত।
হীন গয়াজের বাণী প্রভু ভাব বিনোদিনী,
অবশ্য মিলিব অকস্মাৎ ॥

৩৬। গরীব গৌরলীলা

শরমে শরম পলায়ে গেল।
রাইকানু দুটি তনু যামন দুধে জলে মিলায়ে গেল ॥
চাদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুবা অবশ হ'ল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনমভর ডুবা রহিল ॥
গরীব তাই আপার লাগি মনের দুঃখে মন গুমরি পাগল হ'ল।
সে রসের পাথার পেল না কোথায়, শেষে আচোট ভুঁরে পড়িয়ে ম'ল ॥

---

[৩৫] ব ৪, পৃঃ ৩২।
[৩৬] বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, পৃঃ ২২।

জানি কার রূপ পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
য্যামন ক'রে বাসত ভাল স্যা ওর মনমত আছিল ॥
ও মন আছিল স্যা রূপের কাছে।
গরীব কয় ধরমু ব'লে ডুব্যা প্যালে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে ॥

৩৭।* **গোলাম হুছন [ক]** রাগ বেহার—দেহতত্ত্ব

আলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে।
হরির সঙ্গে রাধা সখী রাই করয়ে বিহার ॥
হরির পদে নেও মোরে সঙ্গেতে তোমার।
আকাষ্ঠা কাষ্টের নাওখানি যবুনার মাঝ।
কাঙ্কাকুরা কালা নিশান সুধু রাধার সাজ ॥
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও ॥
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায় দাঁড় বাইও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও।
গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গ মুখে যায়।
সুপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায় ॥
কহে বাণী গোলাম হুছন রাই রূপের ভমরা।
দেখিলে জীবন ধরে না দেখিলে মরা ॥

৩৮। **গোলাম হুছন [খ]** রাগ দুঃখি ভাটিয়ল—দেহতত্ত্ব

আবের পতন ঘর খাকের বন্দন।
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন ॥
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি।
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাহনি ॥
তার মধ্যে যুড়িআছে সুবইনের ফুল।
পাতালের সেওত পতি সরগে তার মূল ॥

[৩৭] সঙ্গীত সংগ্রহ—শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত।
[৩৮] আবাহন, ১৮৫৪ শক আষাঢ়, পৃঃ ২২৬।

তা অঙ্গে শুসন্ধি স্থওর বেমযাএ।
সেয় ফুল নিরখিলে বন্দের দেখা পাএ ॥
দুই মুখে ফুতে ফুল ঘরে নিপ বলে।
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বুলে ॥

৩৯। **চাঁদকাজী** বংশী

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধৈরা বোজাও বাঁশী আমি মরি লাজে ॥
ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও।
জড়েমূলে উপারিয়া যমুনায় ভাসাও ॥
চাদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥

৪০। **চামারু** ধানসী শ্রীরাধার রূপ

রাধার ভাবে কানুর মন 'বাহির হম্ বাহির হম্' করে
যেখনে রাধিকার সনে দেখা হইল বৃন্দাবনে।
সে অবধি প্রাণি না রয় ধড়ে। ধ্রু ॥
রাধিকার আনন হেন মেনকা সমান যেন
নাসা খগ জিনি সম কীর।
হেম বেসর দোলে কাঁচুলি হৃদেত লোলে
দেখি কানুর প্রাণি না রয় থির।

[৩৯] চণ্ডীদাস পদাবলী মাঃ সঃ সং, পৃঃ ৯৩।
[৪০] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৭৮, পৃঃ ৭১।

দেখি রাধার দুইটি স্তন বন্দী হইল কানুর মন
সাধ করে ধরিতে পাণি রে।
তবে কানু গাহি গীত উদাস কৈল রাধার চিত
তবে রাধা আসে ধীরে ধীরে॥
যে ক্ষণে রাধিকা কানু হইবেক এক তনু
তখনে তন টুটিব তাপ।
হীলাতি চামারু কহে এমন উচিত নহে
রাধা কানু নহে ভিন্ন ভাব॥

৪১। চাম্পাগাজী

করুণ ভাটিয়াল—বিরহ

তুই বন্ধের ছুরতের বলাই লইআ, মুই
মরিআ যাইতুম, তুই বন্ধের বালাই লইআ॥ ধু॥
পিরীতি আনলঘাতে, দহিল মুই নারীর মাথে,
পুড়িয়া হইলুম ভস্ম ছালি।
যদি আইসে প্রাণ পিয়া, হিয়ার উপরে থুইয়া,
এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি॥
মাণিক্য পাইলুম বাটে, লইলুম আপনা হাতে,
হৃদেতে রাখিলুম কথ কাল।
পড়শী হইল বৈরী বন্ধেরে নিলেক হরি,
নয়ালি যৌবন হইল জঞ্জাল॥
করিআ ঘরের কাম, জপিএ তোমার নাম,
দিশি নিশি জানিআ গোসাই।
ভজমান নারী ছাড়ি, যাও বন্ধু কার বাড়ী
হাম নারীর আর লক্ষ্য নাই॥
বিনি বসন্তের বায় যৌবন বাড়িআ যায়,
না দেখিআ প্রাণবন্ধু মুখ।
চাম্পাগাজী ভণে, পিরীতি যতনে,
রাখিলে পাইবা পাছে সুখ॥

---

[৪১] ত্র ৪, পৃঃ ৩; কীর্তন পদাবলী, পৃঃ ৮৬; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, প ১০৪।

৪১ [ক] ছহিকা বানু গান, তাল পোস্তা মাথুর

স্থবল, যা রে বৃন্দাবন
দেখে আস গে রাধারাণী আছেরে কেমন ॥
মথুরাতে আছি আমি পাগল আমার মন,
রাধার জন্ত সদা আমার প্রাণ উচাটন ॥
রাধার পদে ধরে স্থবল করিস্ নিবেদন,
দিবানিশি রাধা প্যারী আছেরে স্মরণ ॥
রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মের মতন,
শীঘ্র গিয়ে দেখব আমি ঐ রাঙ্গা চরণ ॥
মথুরাতে আছি আমি হইয়ে রাজন,
রাধার খেদে ত্যজ্য করব রাজসিংহাসন ॥
ছহিফায় বলে শুন ভুবনমোহন,
কুব্জার কুবুদ্ধিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন ॥

৪২। ছাওয়াল সা বিরহ

সখি আমার এ দুর্দ্দশা, দারুণ প্রেমে হইল গো নিশা।
কালা আমার কুলমান, কালা গলার মালা।
দিবা গেল রাতি হইল, কার সনে খেলিমু পাঁশা ॥
ছাওয়াল সা ফকিরে কইন, আমি কুল দিয়াছি যারে।
মাতা পিতা ভাই বন্ধু, না করিমু কেউর আশা ॥

৪৩। জালালউদ্দী মিশ্র ভৈরবী—দেহতত্ত্ব

আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি
ঝঙ্কারে বাজিছে দিনরজনী।
কে বাজায় কোথায় বসে চলো যাই তার উদ্দেশে
মন কান্দাইয়া সেই দেশে তারে চিননি ॥

[৪১ ক] আল ইসলাহ, ২৮ বর্ষ, ৭ম-৯ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭৮।
[৪২] তরকিতে হক্কানী, পৃঃ ৬২।

সকল রাস্তা বন্ধ করে চলো যাই অন্তঃপুরে
তরঙ্গে বাজিছে তাল তুলিয়ে রাগিণী।
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
নিত্য নিত্য আসে যায় একটি রঙ্গিনী॥
প্রেমে বাধ্য করে যে রেখেছে তারে
সে হইয়েছে এ সংসারে গুণমণি।
খেম্‌টা খেয়ালে আদ্ধা চৌতালে
নাগর নাগরী খেলে করে টানাটানি॥
ঠুংরী ধামালে সামালে সামালে
তিন তারে মিশিয়া বলে আলেক-রব্বানি।
জালালউদ্দী বলে হৃদয় কমলে
রংমহালের কলের গান কেমনে শুনি॥
এস কালা রঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
তোমার লাগিয়ে আকুল পরাণী॥

৪৪। তন্না জলভরা

শ্যাম কানাইয়া আমাকে বধিলায় রে
জলের ঘাটে নিয়া।
জল ভরিতে গেলাম আমি কলসী ভাঙ্গিলায় তুমি,
এই বুঝি পিরীতের রীতি তোমার ও শ্যাম কানাইয়া।
সকলে ভরিল জল আমায় কৈলায় জলের তল,
কদম্বের ডালে বসি জলে ঝলক দেখাইয়া।
প্রেম নদীয়ার ঘাটের জল তাতে করে ঝলমল,
পূর্ণিমাহের মত আমার রসের চান্দ কালিয়া॥
জল ভরিতে সখীগণ চলে আনন্দিত মন,
যেখানে দাঁড়াইয়াছে সোনাচান্দ কালিয়া।
উদাসী তন্নায় বলে আসিয়া নদীয়ার কূলে,
না পাইয়া শীতল জল ফিরি হতাশ হইয়া॥

[৩৩] নূরের ঝঙ্কার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫।

৪৫। তুফানদ্দিন বিরহ

সাত গাইয়া ডাঙ্কা ছুহি রাগ

শুন মাইরে কাছে লাগি এ প্রেম বারাইলা।
ঘরি এক বুলি বন্দু গেলা মোর নথে কত যুগ ভেলা ॥ ধু ॥
চান্দ চন্দনে ন জুরাএ।
পিয়া বিনে মোর মন (ন ?) ভাএ ॥
এথেলা মন্দিরে বসি জাগি।
পিয়া বিনে মোর মন (মনে ?) আগি ॥
কহে তুফানদ্দিন এহি মানসে।
পাইবা রসবতি মানসে ॥

৪৬। দানেশ বিরহ

বাঁকা শ্যামেরে কৈও

নয়ান ত্রিভঙ্গে ভাঙ্গে কুলধনি মান ॥ ধু ॥
নাশে জ্ঞান মূল কিনে জাতি কুল
যাচি যৌবন কর দান।
জগতনাশক অস্থির ঘাতক
তুয়া কটাক্ষের শর।
মুঞি সে অবলা কোমল সরলা
সহিতে শঙ্কট বড়।
হেরি প্রাণ হরে অর্ধ-মৃত্যু করে
এমন বধক কোথা।
বিষ-পানে মরি কহিতে না পারি
শ্যামের চরিত্র কথা।
অবলা বধিলে কিবা সুখ মিলে
রসিক নাগর রায় ?
জীবন যৌবন কৈলু সমর্পণ
ভজিলুঁ ঐ রাঙ্গা পায়।

---

[৪৫] সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮১।

[৪৬] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য পদনং ২৩৮, পৃঃ ১০৭।

ভজমান ছাড়ে কেমন নাগরে
কুলের কলঙ্কী হৈব।
কাম হুতাশন না সহে জীবন
যমুনাতে ঝাম্প দিব।
শ্রীহীন দানেশ কহে উপদেশ
খেদ পরিহরি রায়।
সেই দয়াসিন্ধু বিরহিণী বন্ধু
সেবিতে ঐ রাঙ্গা পায়॥

৪৭। তুলা মিঞা — নৌকাবিলাস

* * *

ধীরে ধীরে নীরে কর পার।
তুফান দেখে হাল ছেড়ো না,
রসিক কাণ্ডার!
কুখেপে মেলিলা খেবা,
অঘোর করিছে দেবা,
মাঝে গাঙ্গে ডুবাইলে তরী,
কলঙ্ক তোমার।
কহে হীন তুলা মিঞা,
শুন লো ব্রজের মাইয়া,
ভজ গো রসিক নাইয়া,
হইবে সুসার।

৪৮। দৈখুরা — বিরহ

আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে সখি রে,
প্রাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে॥ ধু॥
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয় গো রসের খেলা,
তাতে হয় মদন জ্বালা হায় হায় হায়।

---

[৪৭] ন ৪, পৃঃ ৩০। [৪৮] শিক্ষাসেবক, ১৩৩৫ মাঘ, পৃঃ ৩৩।

এ গো শুকনো কমল শুকাই গেলে পায় না মধু ভমরে, সখি রে।
বৃন্দাবনে গেলা হরি না আসিলা আর,
হইল গোকুল অন্ধকার—হায় হায় হায়।
এ গো পরম শোগে স্বগচারিনী ঝুরে ভ্রমর নিরলে, সখি রে।
দৈখুরা পাগলে বলে আল্লার নাম সার,
মিছা ভবের বাজার—হায় হায় হায়।
এ গো কি জোয়াব দিবায় মনা কবর হাসরে, সখি রে॥

৪৯। নওয়াজিস

বিরহ

জগপতি সেবকেরে দেখ একবার। ধু
তোমার সৃজনে আসিয়া সংসার মাঝ
না বুঝি কি চরিত্র তোমার।
ধ্যান করি মনে হেরি ভকতি মিনতি করি
আইস বন্ধু নিকটে আমার।
সবে কহে মথুরার হাটে বন্ধু যায় রাজবাটে
তথা গিয়া বসি নিরীক্ষিয়া।
যে কেহ পন্থেত হেরি তাহারে জিজ্ঞাসা করি
কোথা বন্ধু দেও দেখাইয়া।
অবিরত ভাবি মনে বন্ধুরে দেখিছ কোনে
উদ্দেশিতে আছ অনিবার।
এমন ব্যথিত কেবা জানাইতে বন্ধুর সেবা
দেখাইতে শ্যামেরে আমার।
সেবিতে নারিলুম পিয়া সেই লাগি দহে মোর হিয়া
সেই ভাবি প্রাণি হইল শেষ।
বিরহ আনল তাপে বিবেচনা করি আপে
আনলে গিয়া করিমু প্রবেশ।
কহে নওয়াজিস হীনে বাৰ্ত্তা আইসে রাত্র দিনে
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত।

---

[৪৯] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৩৭৮, পৃঃ ১৪৮।

দারুণ কর্মের লেখা না ঘটে পুণ্যের পেখা
না দেখিলুম নয়ান বিদিত।

৫০। **নজর মোহাম্মদ** রাগ ধানসী শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া,
অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সে রূপ হেরিয়া ॥ ধু।
বদন দর্পণ যেন আঁখি-যুগ মণি।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি মোহে মন-মুনি ॥
সুধারসময় হাসি বচন অমিয়া।
সুললিত অঙ্গরূপ মৃগাঙ্ক জিনিয়া ॥
কহে নজর মোহাম্মদে রাধার নেহা
ভজ সখি সো নাগর মনোহর গাহা ॥

৫১। **নজির** বিরহ

কুলমান ডুবাইলে রে বন্ধু তুই মানব কুল ডুবাইলে।
তুই আমারে এ জগতে কলঙ্কিনী কইলে রে বন্ধু
নিদারুণ কঠিন বন্ধুরে ॥
স্বপনেতে দিলায় রে দেখা না পাইলাম জাগিয়া।
কি দোষ পাইয়া আমায় না চাও ফিরিয়া ॥
মুই যদি জানিতু রে বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া।
সারানিশি পোযাইতু তোরে উরেতে লইয়া ॥
সদায় জলে হিয়ারে বন্ধু তুই শ্যামের লাগিয়া।
অধম জনে কৃপা করি চাহ না ফিরিয়া ॥
অধম নজিরে রে বলে মনেতে ভাবিয়া।
রাত্রিদিন গুনাহের মাঝে রহিয়াছি ডুবিয়া ॥

[৫০] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৮, পৃঃ ৪২।
৫১] রাগ-মারিফত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫।

৫২। নশীর মামুদ তুড়ি—গোষ্ঠ

ধেনু সঙ্গে, গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম, সুন্দর শ্যাম,
পাচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরি।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি,
তরুণী-তনয়া-তীরে কেলি,
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি,
ফুকরি চলত কানরি॥
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি,
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি,
চারু চন্দ্র গুঞ্জাহার,
বদনে মদন ভানরি।
আগম নিগম বেদসার,
লীলায়ে করত গোঠবিহার,
নশীর মামুদ করত আশ,
চরণে শরণ দানরি॥

৫৩। নাকিস্ত বিরহ

প্রেমানল দিয়া হায়রে বন্ধু ছাড়িয়া গেলায় মোরে রে
হায়রে বন্ধু কি বলিমু তোরে।
মনে বড় সাধ করিয়ে হায়রে বন্ধুরে যদি পাই।
চরণে ভকতি দিয়া হায়রে অন্তরে লাগাই॥
আমি অভাগিনী ডাকি রে বন্ধু হইয়া কাতর।
আংখির কাছে থাকি হায়রে বন্ধু না দেও উত্তর॥
একই ঘরে থাকিয়া হায়রে বন্ধু না দেও মোরে চিন।
তোমারে কি দোষ দিমু হায়রে আমার তুর্দ্দিন॥

---

[৫২] ব্র: ৩, পৃ: ২৩ ; সাহিত্য, ১২৯৯ ভাদ্র, পৃ: ৬২২ ; তরু, ১৩২৯ নং পদ ; র, পৃ: ২ ; সু সমাচার, পৃ: ৩০৬ ; পা, নং ২ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃ: ৩০ ; A History of Brajabuli Literature ,p. 586। [৫৩] রাগ-মারিফত, ১ম ভাগ, পৃ: ১১।

বুকেতে মারিয়া গেলায় রে বন্ধু পিরিতের শেল।
এই সে জীবন হইতে হায়রে মরণ হইলে ভাল॥
যে যারে কলঙ্কি করে রে বন্ধু ভবের বাজারে।
উচিত না হয় প্রাণের বন্ধু হায়রে ছাড়িয়া যাইতে তারে॥
জনম গোয়াইলাম হায়রে বন্ধু ঝুরিয়া ঝুরিয়া।
আংখি বুঝি অন্ধ হইব হায়রে পন্থের দিকে চাইয়া॥
নিশ্চয় জানিলাম রে বন্ধু কঠিন তোর অন্তর।
মুখেতে অমৃত তোমার হায়রে হৃদয়ে জহর॥
অধম নাকিন্তে কয় রে বন্ধু তোমার চরণ সার।
দেখা দিয়া প্রাণের নাথ হায়রে মোরে করিও পার॥

৫৪। নাসির পঞ্চম—বিরহ

যাই কোন ঠাই সজনী সই,
বন্ধের লাগি যাব কোন ঠাই? ॥ ধু ॥
প্রেম বাড়াইয়া কালা দিলি মোরে এথ জালা
কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই?
এ চারি প্রহর নিশি শয্যার উপরে বসি
ঝুরি ঝুরি রজনী গোঁয়াই ॥
যৌবন হইল ভারী ধৈর্য্য ধরাইতে নারি
কিসে মন রাখিমু মানাই।
এতিম নাছিরে ভণে যাও ধনি কদমতলে
যদি চাহ সুন্দর কানাই॥

৫৫। নাসিরুদ্দিন গান্ধার অনুরাগ

আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু
তুমি মোর তিলকের ফোঁটা।
দৈবে সে তোমার লাগি হৈয়াছম বৈরাগী,
তাতে কিবা লাজ খোঁটা॥

[৫৪] ব্র ৩, পৃঃ ১৯। [৫৫] ব্র ৩, পৃঃ ১৬।

পিরীতি অবশেষ না রহিমু এই দেশ
আনল দিয়া যাইমু ঘরে।
নিতি রাধার মন করে উচাটন
বাহির হম্ হম্ প্রাণি করে ॥
করেতে কঙ্কণ নয়ানে অঞ্জন
পিন্ধনে পাটের সাড়ী।
করেতে মন্দির চরণে নেপুর
কেন ফির বাড়ী বাড়ী ॥
অন্তরে আগুনি বাহিরে আগুনি
আগুনি এ দশ দিশা।
নাছিরদ্দিন এ মিনতি ভণএ
দয়া না ছাড়িও শেষ ॥

৫৬। নাসির মোহাম্মদ মায়ূরী হোলী-লীলা

চলহ সখী নাগরী মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায় ॥ ধু ॥
যত কুল ব্রজনারী অঞ্জলি ভরি ভরি
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়।
ক্ষণে যায় যমুনার জলে ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটি বাজাএ ॥
শুনিয়া বাঁশীর তান ত্যজে মানীর মান
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়।
কহে নাছির মহম্মদে ভজ রাধে শ্যামপদে
বিলম্ব করিতে না যুয়াএ ॥

৫৭। নেমত হোসেন বাসক-সজ্জা

বন্ধু রইলেরে কোথায় আয় রে বন্ধু আয়
এমন সুখের নিশি পোহাইয়া যায়।
সাজাইয়া নিকুঞ্জ মন্দির আমি বসিয়াছি আসার আশায় ॥

[৫৬] র ৩, পৃঃ ১৯ ; প্রাঃ পু বিঃ, পৃঃ ২, গ্রন্থ নং ২। [৫৭] রাগ-মারিফত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২।

নানা জাতি ফুল দিয়া রাখিয়াছি হার গাথিয়া
দিব বলে বন্ধুয়ার গলায়।
সে মালা ভুজঙ্গ হইয়া দংশিল রাধার গায়,
বন্ধুহারা জীবন যার মিছা ভবে আসা তার
মানবজনম বিফলে কাটায়।
মুর্শিদ পদে মাথা রাখি নেমত হোসনে গায় ॥

৫৮। পাগলা কানাই

কীর্ত্তন

হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই
তোরা কেউ খেলতে যাবি ভাই
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি
যে খেলে সে ঝুরছে তাই ॥
কানে কানে দোকান ভরা হরিনাম মনোহরা
তাপিত প্রাণ শীতল করা সুধা পারা যত খাই
যাতায়াত সহজ সোজা খাজা গজার মুখে ছাই
ভাব রসের কারবারী, না জানে দোকানদারী
যে খায় এস্তার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুতে নাই বমাল
দোকানী এমনি সখাল খুঁজলে হাতে হাতে পাই।

৫৯। পাঞ্জশাহ

বাউল

তারে ধরব কি সাধনে।
ব্রহ্মা-আদি পায় না যারে যুগ যুগান্তর ব'সে ধ্যানে।
বেদ-পুরাণে পাবে নারে নিরূপ নৈরাকারে,
নিরাকারে জ্যোতির্ম্ময় আছে ব'সে নিত্যস্থানে।
অনাদির আদি মানুষ আছে সে গোপনে,
সেই মানুষ সাধ্য করে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে।

---

[৫৮] বাঙ্গালীর গান, পৃঃ , কবি পাগলা কানাই, পদ সং ১৩৩।
[৫৯] বাংলার বাউল গান, পদ সং ২৫৭, পৃঃ ২১০।

চিন্তামণি-ভূমিবৃক্ষ-কল্প একে বলে
গোপীরূপা যার হ'য়েছে, সেই পেয়েছে রত্নধনে।
সখা-রূপে যে দেখেছে গুরুর ধিয়ানে,
পাঞ্জু বলে, সেই রসিক দাসী হবে শ্রীচরণে।

৬০। **পির মোহাম্মদ** তুড়ি নৌকাবিলাস

ন যাইলে (যাইমু) মুই মথুরার হাটে
নৌকা ফিরাইয়া দে ॥ ধু ॥
মুই অভাগিনী, নৌকাতে চড়িলুম,
কানাইআ ধরিল খেবা।
হেনহি সময়ে, মোর বৈরী হএ,
চলিল মালিআ দেবা ॥
একি আভাঙ্গা নাও, কিবা বইটা বাহো
চৌদিগে উঠিল পানি।
এহা কি পরিহাস, জাতি কুল নাশ,
ধনে প্রাণে হইলুম হানি ॥
দধি দুগ্ধ মোর, যথেক আছিল,
সব হইল ঘোল।
যেই ঘাটে কানাই, নৌকাতে চড়িলুম
সেই ঘাটে নিয়া মোরে তোল ॥
শুন শুন রাই, তোমারে বুঝাই,
পির মহম্মদ ভণে (বলে ?)।
এই ঘাট পার, হইআছি (আছ ?) বারে বার,
মথুরা যাইবার ছলে ॥

৬১। **ফএজররহমান** গীত নিবেদন

নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ নারায়ণ
রক্ষা কর ভজিলুম রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥

---

[৬০] ত্র ৪, পৃঃ ৪০। [৬১] গোলশনে বাহার, পৃঃ ৫০।

ধুঃ— তন্ত্র মন্ত্র দেবারাধ্য সেবা শান্তি যোগে বাধ্য
এক নাম বিনে সব অকারণ।
তুমিত সতত সঙ্গে খেলিতেছ রঙ্গে ঢঙ্গে
অদর্শন ভাবিতেছি হৃদয়ে নাই নয়ন।
উদ্ধার সঙ্কট ত্যজি তোমা রাঙ্গা পদে ভজি
গান রচে হীন ফএজুররহমান॥

৬২। ফকীর শাহ বাউল

রহিয়াছে প্রভু করতার।
অমাবৈস্যা প্রতিপদ ত্রুতিয়াএ রৈল হট
জোয়ার না ফিরে একবার।
কি করিমু কোথাএ যাইমু কাতে যুকতি বিমর্ষিমু
এবে সে মরণ হৈল সার।
আব আতস বাত খাকের ধড় বাঁশী ফুকে নিরন্তর
না বুঝি রাধিকা অভাগিনী।
দুই বাঁশী এক স্বর নৌকা ঠেলে বারে বার
নৌকা ঠেকিল বালুচরে।
মুই অভাগিনী নারী নিশি দিশি বসি ঝুরি
বন্ধুরে দেখিতে একবার।
বন্ধু মোর নিঠুর হৈল আহ্মা প্রতি ছাড়ি গেল
এ ঘর করিয়া অন্ধকার।
কাজলা কোঠার ঘর আন্ধার হৈল মোর
সব মোর হৈল অথান্তর
দিবা আঁখি ধন্দ ধরি অনেক যতন করি
মানে বৈসাইলা বাম পাশ।
বাম পাশে থাকি চোরে মাণিক্য হরি নিল মোর
একা আহ্মি কি বলিমু কারে।
ফকীর সাহার বানী পির পদে তত্ত্ব জানি
রৈলুম চরণে তোহ্মার।

---

[৬২] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৩৩১, পৃঃ ১৩৩।

৬৩। **ফজল** বিচ্ছেদ বিরহ

প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার।
ছখি গ কৈ রৈল প্রাণ বন্ধুয়া আমার ॥ ধু ॥
থাকিতে জীবন হল না পদার্পণ,
বল সখি উপায় কি তাহার।
বিচ্ছেদের জ্বালায় কান্দে প্রাণ,
সদায় কেমনে ধারে যাই তার।
পিরীতি করিয়া রৈল সাম লুকাইয়া,
বহু দোষ পাইয়া আমার।
আমি দুরাচারী চরণের ভিখারী,
কেমনে ভুলি ত্রিভঙ্গিনী তার।
জিতে না হইল দেখা শুন গ বিসখা,
মরিলে হবেনী গ আর।
বলে হীন ফজলে ভেইবে প্রেমাকুলে,
ও তোর কৃপাগুণে লাগাও কিনার।
সখি কৈ রৈল প্রাণনাথ বন্ধু আমার ॥

৬৪। **ফজলল হক** গজল বিরহ

কালাচাঁদে বাসি ভাল আর ত প্রাণে বাঁচি না।
কালা কালা জপি সদা পেলেম কত যাতনা ॥
এমন কঠিন প্রাণ বল প্রিয়ে কি কারণ।
চুরি করি নিয়ে মন ভাল আমায় বাস না ॥
ভাল শিখিয়াছ প্রিয়ে চুরি করি মন নিয়ে।
কাঁদাই কৌতুক দেখ মর্জ্জি মত আপনা ॥
জানি না যে তব মনে আছি কিনা হীন জনে।
ধরা আছি তব হাতে পালাইতে পারি না ॥

---

[৬৩] হজরত শাহ ছিদ্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবনচরিত, পৃঃ ৩৫। [৬৪] মহাম্মদী এস্কে ভাণ্ডার, পৃঃ ১২।

৬৫। **ফতন** রাগ—রামগরা খণ্ডিতা

কার ঘরের নাগর তুহ্মি কালিআ সোনা
কার ঘরের নাগর তুহ্মি।
আউলাই কুন্তল মুখখানি ঝাপিআ রৈছে
ভালে চিনিতে নারি আমি ॥ ধু ॥
নঅনের কাজল বআনে লাগিছে
কথাএ আছিলা পরবাসী।
ঘুমের আলসে হালি ঢলি পড়ে
শুতি না ছিলা আজু নিশি ॥
প্রেমের আনলে সকল শরীর জ্বলে
কি হইল জঞ্জাল দিআ।
হীন ফতনে কহে ওরে সোণার বন্ধু
কঠিন তোহ্মার হিআ ॥

৬৬। **ফতেখান** রাগ—কহু বিরহ

প্রাণ সই কি কহব হামো হতভাগী।
দুঃসহ মদন সরে দহে মোর (মোরে ?) নিরন্তরে
উঠিবসি নিশি রহো জাগি ॥ ধুঃ ॥
বসন্ত থরিএ গেল পাউকের রিত ভেল
এবেহু ন আইসে পীউ মেরা।
ঘন ঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন
দশদিশ বহে ঘন ধারা ॥
কুলিস দাদুরি নাদ পাপী অতি পরমাদ
কুসুম পরশে তনু কাম্পে।
মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল
পিআ বিনে সকলি সন্তাপে ॥
কি এ বিধি ভেল বাম পিআ গেল দূর ঠাম
তনু সে জৌবন গেল ভারা।

[৬৫] ভাঃ, ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৪। [৬৬] সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮৩।

জদি সে না মিলে পিউ আনলে তেজিমু জিউ
পিআ বিনে সব আন্ধিয়ারা ॥
কহে ফতেখানে সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত এব্রাহিম খান্।
ভব কল্পতরু জান হ আম্মার গুরু
পির মির সাহাছুলতান ॥

৬৭। বক্সাআলী

বিরহ

* * *

হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি,
ডুবাইলা শ্যাম অবলার জাতি ॥ ধুঃ ॥
হৃদেতে কালী রাখিয়া শ্যাম।
মুখে মিছা মায়া দিয়া পুরাইলা মনস্কাম।
লোকের বৈরী মোরে করি ছাড়ি গেলা কুমতি।
আমার এখন একুল ঐকুল দোন কুল ডুবাইলা।
কোন্ কামিনীর ফাঁদে গেলা, ও নাগর কানাই।
আমার এই মনের দুঃখ কৈমু কারে।
কি জন্যে নিদয়া জানি হইলা আমারে।
নিদয়া হইয়া কেন কালা না পুরাইলা আরতি।
হীন বক্সাআলীর বচন * * *

৬৮। বদিয়ুজ্জমা

বাউল

আরে ভরিয়া সুবর্ণের ভরা না রাখিলাম ধারে।
লহরে মারিয়া রে নৌকা ঠেকাইল বালুচরে রে
নাইহরের বন্ধু
আরে কালা ধলা দুইটারে পাখী এই সংসারে চরে।
আপনার মন পরিচয় নাই বিবাদ ঘরে ঘরে ॥

---

[৬৭] ব্রঃ ৮, পৃঃ ২২ ; পূর্ণিমা, ১৩০৯ আষাঢ়, পৃঃ ২৮।
[৬৮] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ৩২৫, পৃঃ ১৩১।

আহাদ আছিল রে প্রভু মিম জন্মাইয়া।
ত্রিভুবন স্থজিল রে প্রভু কুদরতে কম্পিয়া ॥
সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্যাম।
কালার ভিতরে লুকাইরে রৈছে মওলার নিজ নাম ॥
আসমান কালা জমিনরে কালা কালা পবন পানি।
চাঁদ কালা সূর্য রে কালা কালা মওলাজি রব্বানী ॥
কহেরে বদিয়ুজ্জমা একি অন্ধকার।
আয় মিম একায়ুক্তে কর রে নিস্তার ॥

৬৯। **বদিয়ুদ্দিন** লাচাড়ি দেহতত্ত্ব

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ। ধুঃ।
অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে,
আকুল করিল নারীর চিত ॥
শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী,
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
ন দেখি তোমার জ্যোতি, স্থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর নারীর সনে ॥
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি,
তুমি দয়া ন করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কোনে,
তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥
তোমার কৃপা ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা ন দেও রাধারে ॥

---

[৬৯] ভ ৪, পৃঃ ৪১ ; প্রা, পু, বি, পৃঃ ৬৩, ৮৭ নং গ্রন্থ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ৪২

তনুর অন্তরে পশি, মনুরা রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥

৭০। বহরাম

অনুরাগ

দুঃখ সহিতে নারি
অবলা পিরীতি করলাম কদমতলায়। ধুঃ।
বন্ধুর লাগি ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত মোর হৈল কালা।
উদাসিনী কৈলা মোরে দিয়া তুমি প্রেম-জ্বালা।
প্রেম-জ্বালা সহিতে নারি আমি অবলা।
ঝাঁপ দিয়া মরিমু জলে না পাইলে চিকণ কালা।
ভণে বহরাম হীনে বুঝ প্রেম-খেলা
অল্প ব'সে কৈলে পিরীত সেই পিরীতির প্রেম ভালা।

৭১। বুরহানী

বাউল — নিবেদন

শ্যামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো॥ ধু ॥
দেখিতে শ্যাম কালাসোনা কুলমানের ভয় রাখে না।
সুভাগ্যে দেখিলাম আমি প্রাণবন্ধু কালিয়া গো।
শুন বন্ধু দয়াময় যদি তোমার মনে লয়।
শ্রীচরণে রাখ মোরে দুঃখিনী জানিয়া গো।
গেলে বন্ধু আর পাব না, মনে রইব প্রেম যাতনা।
বুরহানী কয় শ্যাম বন্ধুরে যৌবন দেও জাচিয়া গো।

৭২। ভেলা শা

জলভরা

আলো রাই! যমুনায় নি যাইতে।
ভাঙ্গিল মাটির কলসী প্রাণ বন্ধুয়ার দিগে চাইতে ॥

---

[৭০] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, সংযোজন, পৃঃ ১৯৫। [৭১] এস্কে গোলজার, পৃঃ ৪৮।
[৭২] পল্লী-গীতি-সংগ্রহ

ওরে হইলু ঘরের বার সঙ্গে লৈয়া দাসী।
ভাঙ্গিল মাটির কলসী মোর গোকুলে রৈল হাসি॥
পায়েতে নেপুর শোভে গলে শোভে হার।
চলিলা সুন্দরী রাধে জল ভরিবার॥
চলিলা যতেক সখী কুম্ভ লইয়া মাথে।
আচম্বিত শুনিলা বাঁশী যবুনাতে যাইতে।
কদম ডালে বসিয়া বন্ধে ফুকে মোহন বাঁশী॥
না গেলু যবুনার ঘাটে ও মুই হৈলু উদাসী॥
কুক্ষণে হৈলুরে বার অকুল ঠেকিল মাথে।
ভুখিলা বাঘের হাতে ও মুই ঠেকিলু রাজপন্থে॥
না ভরিনু যবুনার জল মুই নারী অভাগিনী।
বাহিরে বন্ধুয়ার জালা ঘরে ননদিনী।
সব সখী গেলা ঘরে জল লৈয়া তারা।
কন ফকীর ভেলা শায় ও মোর কলসী না গেল ভরা॥

৭৩। **মছনতাজ** রাগ গান্ধার বিবিধ

কামিনি না কর গুমান ছল ধনি।
যৌবনরূপ ধন না রৈবে নিদানি॥ ধ্রু॥
আহ্মার বচন তোহ্মা না সাধিলা কাল।
অবসর গেলে পাছে ঠেকিব জঞ্জাল॥
না হকে বুঝল সখী তোহ্মা নাহি গ্যান (জ্ঞান)।
আসিতে জাইতে আসে নিশি শেষ বেআন॥
কহে মছনতাজ সখী শুন দিআ কান।
সুপুরুষের বোল কভু ন টলিবে জান॥

৭৪। **মতাহির** বাউল

শ্যাম বন্ধুয়ার আড়ালে ভাইসে উঠি নয়ন জলে।
ভবে আসি লাগছে ফাঁসি কান্দি বসি নিরলে॥

---

[৭৩] সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮৩।

[৭৪] হৃদয়বীণা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০।

(আর) ডাক্তার বাবু বলে মোরে,
তোমার কালাজ্বর হইছে শরীরে।
আমি বলি মরি জ্বলি নাহি কলি স্বফুলে ॥
দিব নিশি আছি জাগি,
বন্ধু তোর দ্বারে ভিক্ষা মাগি।
আসবে বইলে দাস বানাইলে না আসিলে শেষকালে ॥
আগে দেখাই শশী কলা,
বন্ধো! শেষে দিলে কানমলা।
গাছে তুইলে মই সরাইলে চোর ঠরাইলে দলিলে ॥
মতাহিরে ভাবনা করে,
বন্ধো! দিন কাটাইলাম ডাইকা তোমারে।
মরণ কালে কল্‌মা দিলে কিবা দুঃখ যায় চলে ॥

৭৪। [ক] মনকর

তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম জাতিকুল ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী, তুই হাসাইলে গকুল ॥
তুই ভাসাইলে দুই কুল।
রে অন্তরায় রইল শূল ॥
আমার গো আশা মনে রইল 'অমূল' (অপূর্ণ)
ফুলের বাগানে যেমন বঞ্চিত বুলবুল
রে অন্তরায় রইল শূল ॥
অধীন মনকরে বলে ভাবিয়া রসুল
আমার আশায় দিন ফুরাইল চইক্ষে দিয়া ধূল।
রে অন্তরায় রইল শূল ॥

৭৫। মনোহর কানড়া বা পুরবী বিবিধ

বন্ধুয়া বলিমু কোন লাজে রে স্বজনী সই
কালিয়া বলিমু কোন্ লাজে ॥ ধু ॥

[৭৪ক] বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬।২য় সং, পৃঃ ৪৪। [৭৫] ঐ ৪, পৃঃ ৬২।

বন্ধুয়া বন্ধুয়া কালিয়া তোর নাম।
প্রভাত হইতে কর ঘর গৃহ কাম ॥
গৃহ ঘরের কাম কর বাথানে রাখ ধেনু।
ষোলশ' গোপিনী মাঝে এক রাধাকানু ॥
আরের বন্ধুয়া বৈসে পালঙ্গ মহলে।
আসিলে আমার বন্ধু বৈসে কদমতলে ॥
কদম্বের তলে থাকি শ্যামে বাঁশী টানে।
মন উদাসিনী কৈল সেই বাঁশীর সানে ॥
দেখি মনোহরে কহে কদম্বমালা গলে।
দিবেক সে সব মালা কাঁচা রাধার গলে ॥

৭৬। **মনৌঅর বা মনুঅর** আহির পরছ স্বপ্নে-মিলন

আজু সই কি দেখিলুং স্বপনে।
বিদিত বিমল হরি মিলিল আপনে। ধু ॥
সারদ সমএ যেন জামিনী উঝল।
ঝলকি ভেল আড়া চমক চপল ॥
নয়ানে লাগিল রূপ আসি আচুম্বিত।
জাগিতে হারাইলুং হরি শোকে দহে চিত ॥
কি দেখিলুং কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর ॥

৭৭। **মর্ত্তুজা গাজী** রাগ-জালালি মাথুর

কি আজু কুদিন ভেলিএ
ছাড়িয়া গোকুল নন্দলাল
মথুরা চলিয়া গেলিএ॥ ধু ॥
আজু মথুরা উঝল ভেলিএ
গোকুল মলিন আজু রাত্রিএ।

---

[৭৬] ভাঃ, ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৭ ; ভা, ১৩২৪ পৌষ, পৃঃ ৭৮।
[৭৭] মুসলিম কবির পদসাহিত্য, নং ২১৮।

মর্ত্তুজা গাজীএ কহএ সারএ
নন্দসুত বাটোয়ার কানু নিশ্চয়।

৭৮। **মিয়াধন** বাউল-ধামালি বিরহ

প্রাণ ললিতা ত্বরা যাওগো বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা।
আমি দাসী চির দোষী শ্যাম পিরিতের মারা॥
বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা॥
ললিতা বিশাখা সখি যাওগো ত্বরা করি।
আনিয়া দেও মোর প্রাণ বন্ধুরে দেখি নয়ন ভরি॥
বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা॥
আমার বন্ধু প্রেমরসিক প্রেমভক্ত আছে।
এগো ভক্ত পাইলে আদর করিয়া প্রেম যাচে॥
বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা॥
নূতন যৌবনে আমার কেমন কেমন করে।
এগো আসলে বন্ধু নূতন যৌবন সপিয়া দিতাম তারে॥
বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা॥
শ্যামভক্ত যেই নারী স্বর্গে পাইছে বাস।
পাগল মিয়াধনে কয়গো আমার না পুরিল আশ॥
বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা॥

৭৯। **মির ফএজোল্লা** কেদার মিলন

রাধা মাধব নিকুঞ্জবনে। ধু
ব্রহ্মা জারে স্তুতি করে চারি বআনে।
হেন হরি নারাঅন দেখিবা নআনে॥
পুষ্প চন্দন লৈআ গুপি (গোপী) সব ধাএ।
মেলি মেলি মারে পুষ্প গুবিন্দের গাএ॥
পুষ্প চন্দনের ঘাএ জর্জ্জরিত হরি।
মাধবিলতার তলে লুকাএ মুরারি॥

---

[৭৮] প্রেম-ভাণ্ডার, পৃঃ ৬।
[৭৯] ভাঃ, ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৪ ; ভাঃ, ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৭।

মাধবিলতার তলে নন্দসুত রৈলা।
শ্রীকৃষ্ণ বুলিয়া গুপি কান্দিতে লাগিলা॥
মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লিলা।
শাঁমরূপ দরসনে দরবহে শিলা॥

৮০। মীর্জ্জা কাঙ্গালী রামকেলি [মতান্তরে সুহই]—বিরহ

কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার। ধু।
অঘোর শাঁঝুয়া বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
শাঁচা যদি না আছিলা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এ দুঃখ না সহে পরাণে॥
যখন পিরিত কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্ন ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখিকোণে॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, অনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া॥

৮১। মীর্জা ফয়জুল্লা ধানশী অনুরাগ

সজনী সই, কানু সে প্রাণধন মোর।
যে বলে বলুক মোরে
যে করে করিব নিজ পতি।
সকলি ছাড়িয়া মুই কানুর শরণ লই
ধিক মোর এই ঘরে বসতি॥
তোমরা যথেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি
কানুর ভাবে হৈয়াছি বিভোর।

[৮০] ব্র ৩, পৃঃ ১১ ; প্রা পু বি ২য় ভাগ, পৃ ৬৭ ; ৫৩১ নং গ্রন্থ ; কাব্যমালঞ্চ পৃঃ ৬১ ।
[৮১] ব্র ৩, পৃঃ ৮ ।

শুনিতে বাঁশীর গান   দ্রবীভূত হয় পাষাণ
রমণীর প্রাণ কথ দড় ॥
চিত্ত উতরোল দেখি   চৌদিকে পলকে আঁখি,
সকলি দেখি এ শ্যাম রায় ।
মনে হেন সাধ করে   নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে
ভজিতে না পারি রাঙ্গা পায় ॥
মীর্জা ফয়জুল্লা বাণী   শুন রাধা ঠাকুরানী
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া ।
জীবন জোয়ারের পানি   তরল তরঙ্গ জানি
ঐ রাঙ্গা চরণ ভজিয়া ॥

৮২। মুছা   বাউল

রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয় ।
এগো অরসিকে প্রাণ দিলে আয়ু থাকতে মরণ হয় ॥
বন্ধুরে রসিক জানি   হইয়াছিলাম উদাসিনী
এগো প্রেমানলে জলে হিয়া মরণের আর বাকী নয় ॥
নিষ্ঠুর বন্ধের প্রেমানলে   সদায় মোর অঙ্গ জলে
এগো আশায় আশায় দিন গেল রজনী প্রভাত হয় ॥
কিবা নর কিবা নারী   যতই আছ প্রেম-ভিখারী
এগো নিষ্ঠুর প্রেমে না মজিবায় না করিয়া পরিচয় ॥
মহুষ্যের প্রেম করিলে   মহাপ্রেমের সন্ধান মিলে
এগো যে জন করিছে স্বজন তার প্রেমে মজতে হয় ॥
দীনহীন মুছায় বলে   প্রেমানলে অঙ্গ জলে
এগো হাসরের বিকার কালে পাইবায় তার পরিচয় ॥

৮৩। মোছন আলী   নৌকাবিলাস

*   *   *   *

মথুরা বাজারে যাই ।
পার করি দে নন্দের কানাই ॥ ধু ॥

[৮২] রাগ-মারিফৎ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০। [৮৩] ঐ ৩, পৃঃ ২৮।

চলিছে রাধে মথুরা বাজার।
ভাণ্ড ভরি মাথে করি দধির পসার॥
ঘাটে চৌকি নন্দের কানাই।
বলে দধি দেরে খাই॥
নানা ভোলা নূতন যৌবনী।
কি দিয়া মানাই যাইমু (যাইবা) ঘাটোয়াল মাঝি?
তুমি কমল আমি ভ্রমর
একা কুঞ্জে চল সাধ পুরাই॥
কহে হীন মোছন আলী রাই।
দান করি নয়ালি যৌবন
পার কর কানাই।
তুমি নাগর ধর কাণ্ডার
আমি দিমু তোরে পান বানাই॥

৮৪। **মোহাম্মদ** না গোধা ভাটিয়াল। পূর্ব্বরাগ

ওকি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে
জার রূথ হিত চিত্ত প্রকাশিত
সাফল নয়ান মাঝে॥ ধু॥
কতুক কারণে গেলু বৃন্দাবনে
দেখিতে ছো বন্ধু শ্যাম।

* * * *

কুঞ্জ নিকুঞ্জ বনে অলিকুল গুঞ্জরে
মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙ্গে।
মল্লিক ই সুখ (?) হেরি পঙ্ক মুখ
হাসি বিকাশিত সঙ্গে॥
নানা পক্ষী রবে সুধারস গাবে
পিআগুণ অনুপাম।

[৮৪] সম্মিলন, ১৩২৪, ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮৩।

পিকধ্বনী ধিক্ চাতক ঘাতক
পিউ পিউ জপে নাম ॥
কহে মোহাম্মদ রহেমান সম্পদ
প্রভুপদে করহ ভকতি।
ও রাঙ্গা চরণে লইলুম শরণে
মরণে তরিতে গতি ॥

৮৫। মোহাম্মদ আলী গুর্জ্জরী রাধার পুর্ব্বরাগ

নাগর কানাইয়ারে
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে ॥ ধ্রু ॥
জঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচেরে
তা দেখিয়া মোর হিয়া ফাটে ॥
যমুনার জলে যাইতে বৃষ্টি পাইল রাজপন্থে
ধোলাইল শিরের সিন্দুর রে ॥
বেহানে পড়িল রাধা কেনে গেলুম কলঙ্কী রাধা
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ মোর পড়ি গেল ঢেশা রে ॥
পদ পরে পদ থুইয়া কদম্ব হেলান দিয়া
বাজাএ বাঁশী প্রিয়া নাম লৈয়ারে ॥*
দংশিল অনঙ্গ জাগে বেদমন্ত্র নাহি লাগে
বিষে ছাইল সর্ব্বঅঙ্গরে ॥
মহম্মদ আলীএ ভণে দুঃখ মনে
ভাব প্রভু এক সার রে ॥

৮৫ (ক)। মোহম্মদ চুহর চন্দ্রাবলী ছন্দ

সাজএ কুমারী পরম সুন্দরী
শ্যাম উদ্দেশে গমন।
সব সখী নাগরী কুমারীক বেঢ়ি
করএ বিবিধ সাজন।

---

[৮৫] ত্র ৮, পৃঃ ২। [৮৫ ক] বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭, ৩য় সং, পৃঃ ৭০।

লইয়া চাচরি বিনি জটাছিরি
সম্ভোগে ত্রিপ্যাচ গুণনা
মুক্তা মালা ছড়া গুম্ফিল লড়া লড়া
বিনি ফাঁসে কৈল গোপনা
সিন্দুর প্রচুর যেন প্রাতঃ স্বর
স্থির স্বর্ণ প্রায় শোভনা
খাচামত বলি শাড়ি গঙ্গাজলি
সুন্দরী করিলা ভূষণা
গাএত পঞ্চম শব্দ মনোরম
নূপুর ঝুনু ঝুনু বাজনা।

৮৬। মোহম্মদ পরাণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ

হরির অরিপতি তাহার সন্ততি
বাম পাশে চূড়া টালিছে
মাথে নানা ফুল দেখি অলিকুল
উড়ে উড়ে ভ্রমি রহিছে।
পঙ্কজ লোচন নাসিকা গঠন
ভুবনে নাহিক তুলনা
না চলে নয়ান হেরিতে বয়ান
হেরি মুনি-মন-মোহনা।
ভালএ শ্রীখণ্ড ভুরু কামদণ্ড
নয়ান অঞ্জনে রঞ্জিছে।
ভুজ ভুজঙ্গিনী কটিতে কিঙ্কিনী
তাতে বনমালা শোভিছে।
সুললিত ধ্বনি গাগরী কিঙ্কিনী
চলিতে রুণুঝুণু বাজিছে
কহে মোহাম্মদ পরাণ এই পদে লেগে নাম
সংসার ছাড়ি মন লাগিছে।

[৮৬] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ১০, পৃঃ ৪৩

৮৭। মহম্মদ হানিফ কল্যাণ রাধার পূর্ব্বরাগ

মধুর মুরলি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ চলহ মধুর ॥ ধু ॥
কি রঙ্গ দেখিলাম সইরে যমুনার কূলে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটফট করে ॥
কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিল হরি!
ঝামরু ঝামরু নাচে আপনা পাসরি ॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর চলিআ যাইতে নিরক্ষি চাহিলুম ॥

৮৮। মোহাম্মদ হাসিম বংশী

ন জানো ন চিনো কেবা জমুনার কূলে।
দূরে থাকি বাজাএ বাঁশী ফুলের মালা গলে ॥ ধু ॥
খেনে হাটে খেনে বাটে খেনে তরুমূলে।
খেনে খেনে তার বাঁশী রাধা রাধা বোলে।
খেনে খেনে বান্ধে চূড়া খেনে খেনে খোলে।
খেনে খেনে বাঁশীর নাদে জল তোলে কূলে ॥
মোহাম্মদ হাসিমে কহে ভুবন মোহিলে ॥
কার বাঁশী হেন হি বুলিবে ব্রজকূলে ॥

৮৯। রঊফ বিরহ

বন্ধুরে দেখিতে যাব আমি গো নদিয়া।
পাইলে তারে জিজ্ঞাসিব পায়েতে ধরিয়া ॥
শুন শুন ওহে নাথ শুন মন দিয়া।
ছাড়িয়া আসিলে মোরে কি দোষ দেখিয়া ॥
শত দোষের দোষী আমি আছিত জানিয়া।
ক্ষমা চাই তব পদে বিনয় করিয়া ॥

---

[৮৭] ব্র ৩, পৃঃ ২৯ ; প্রাঃ পুঃ বিঃ পৃঃ ১৮৭, ২৯৯ নং গ্রন্থ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ৪১।
[৮৮] ভা. ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৯। [৮৯] বিচ্ছেদ সঙ্গীত, পৃঃ ৯।

দয়া কর মোর প্রতি দুঃখিত জানিয়া।
নহেত মরিব আমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
রউফ বলে বল তারে পায়েতে ধরিয়া।
মরণ সময় কালে দেখে যে আসিয়া॥

৯০। **রজব** বাউল বিরহ

সখি! চাইয়া দেখ্‌গি যদি পাছগো তারে পথে।
যায় সে গোপীমোহন বংশীবদন ধেনু নিয়া বংশী হাতে॥
আমার নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্দ্রাবলী।
রাখবে না আর নয়নমোহন সব জালার অন্ত করবে
অঙ্গ মিশাই অঙ্গেতে॥
গলায় তার বনমালা চিকন কালা গোপীনীর সাজে।
ষোলশ' গোপীনীর মাঝে নিতি করে খেলা॥
ভাবছি পাই যদি গো আমি অবলা চিকন কালা।
তারে কিবা পরি গলে কিবা বান্ধি অঞ্চলেতে॥
ছাপাইয়া রাখি কিবা আউলা চুলের বেণীতে।
রজব বলে ও প্রাণশশী পাইতে পার সেই উদাসী॥
বৌ হইয়া প্রেম খেলিয়া শাশুড়ী হইয়া বুঝাইতে।
যদি পার প্রেম খেলা খেলাইতে॥

৯১। **রহিম উদ্দিন** বংশী

কোন নাম জপে গো শ্যাম বন্ধের বাঁশী
জান কি গো প্রাণ সজনী।
বাঁশীর মাঝে যাদুর ফাঁসী আমার নিল গো পরাণী॥
যেই নাম বাঁশীয়ে বলে সেই নামের ভেদ পাইলে গো।
এগো লাহুতের তালা খুলে অন্ধকার হয় রৌশনি।
এই নাম পাশরিলে মরণ হইব সেই কালে গো।
এগো জাতি আর ছিফতি গুরে ঐ নামের ভেদ খানি॥

[৯০] মুর্শিদি ভাটিয়ালী, পৃঃ ১০। [৯১] রাগ-মারিফত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯।

ত্রিপিনীর (?) ঘাটে বসি   কালাচান্দে বাজায় বাঁশী গো।

এগো বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী।

দারুণ বাঁশীর স্বরে   রহিতে না পারি ঘরে গো।

এগো মনে লয় দেখিতাম গিয়া সঙ্গে বৈরী ননদিনী।

কুলমানে দিছি কালী   অলঙ্কার লোকের গালি গো।

এগো নাইরে আমার লাজ ভয় দৈবে রাধা কলঙ্কিনী॥

প্রাণের দুতী বলি তোরে   আনিয়া দে মোর প্রাণ বন্ধুরে

এগো জিতে না হইলে দেখা মইলে আর পাইমুনি।

শ্যামচান্দে বাজায় গো বাঁশী   কিবা দিবা কিবা নিশি গো।

এগো "কাফ" আর "নু" হরফে সংসার হইল জানি॥

দমে নামে মিলন করি   বাঁশীর উপর ধ্যান করি গো।

এগো দেখ চাইয়া তোর লা মোকামে বিরাজ করে নীলমণি।

ফকির রহিমুদ্দিন বলে   প্রাণ থাকিতে প্রাণ না দিলে গো।

এগো যে হইছে পিরিতের মারা সে পাইছে শ্যাম গুণমণি॥

৯২। রেয়াছক পুরবী রূপ

হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি। ধু।

বন্ধুর বন্ধন   দুঃখীর কাঞ্চন

নিধনিয়ার ধন তুমি।

মধুর বচন বুলি   জগত করিছ বন্দী

নিঠুর হইয়া কেনে থাক।

মায়ার জঞ্জাল ছাড়ি   রৈয়াছি আনন্দ করি

কিসের লাগিয়া তুমি কান্দ।

কহে রেয়াছক এহি   স্বপনে ভুলাও আসি

তোমারে না দেখি আমি মরি॥

৯৩। লালন গৌর-লীলা

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।

মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা॥

[৯২] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পদ সং ১১, পৃঃ ৪৩। [৯৩] প্রবাসী, ১৩২২ মাঘ, পৃঃ ৯০৫।

গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই॥
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হয়েছে কি ধনহারা॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে॥
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদবিধি চমৎকারা॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি হয়।
গোরা তারমাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়॥
অধীন লালন বলে ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা॥

৯৪। লালবেগ মিলন-স্বপ্নে

* * *

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া॥ ধুঃ॥
আইল চিকনকালা সময় জানিআ।
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইয়া॥
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া।
যৌবনের গরবে মুই না চাহিলুঁ ফিরিয়া॥
পিউ পিউ বুলিয়া বালিস লৈলু উরে।
চৈতন্য পাইয়া দেখো পিয়া নাই মোর কোলে॥
মনের আকুতে মুই এখলা নিদ যাম্।
কেনে রে দারুণ বিধি মোরে হৈল বাম্॥
কহে কবি লালবেগে স্বপ্নেত জাগিয়া।
খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চান্দমুখ চাহিয়া॥

৯৫। লালমামুদ নাম-মাহাত্ম্য

প্রভো বিশ্বমূলাধার।
অনন্ত নাম ধর তুমি তোমার হয় অনন্ত আকার।
কখন সাকারেতে বিরাজ কর কখন নিরাকার॥

---

[৯৪] ব্র ৪, পৃঃ ৩৩ ; প্রাঃ পুঃ বিঃ, পৃঃ ২৪৯, ৩২৭ নং গ্রন্থ ; সাহিত্য, ১৩১০ ফাল্গুন, পৃঃ ১৯২৭। [৯৫] সৌরভ, ১৩২৩ বৈশাখ, পৃঃ ২০৩।

কেহ তোমায় বলে কালী কেহ বলে বনমালী।
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমাকে ডাকে সারাৎসার ॥
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার।
অনন্ত নাম ধরে ধরে ভক্তে বাঁধ ভক্তি-ডোরে
তোমারে টানে অনিবার ॥
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার
হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান,
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতির কি বিচার ?
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার।
জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবি না একবার।
(এবার) লালমামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার ॥

৯৬। শাহ আকবর

সুরট—গৌরলীলা

জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥ ধু ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া। *
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া ॥
ঐছন পহুঁকে যাঙ বলিহারী।
শাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥

৯৭। শীতালং

পিরীতি-পরিচয়

পিরীতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার
কুলমানের ভয় নাইরে তার ॥ ধু ॥

[৯৬] র ৪,পৃঃ ৩৬ ; র, পৃঃ ১ ; গু সমাচার, পৃঃ ১০৬ ; গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, ২৯নং পদ ; পা, নং, ১ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ১৯৫। [৯৭] শিক্ষাসেবক, ১৩৩৪ কার্ত্তিক, পৃঃ ১৮ ; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ৭৯।

পিরীতের নয় নিশানি সদায় থাকে উদাসিনী গো
এগো চেরা মলিন থাকে তার
দিবানিশি বেকরার ॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে জলধারা দুই নয়নে গো
এগো ছির ঘুরে প্রেমধুন্ধে
দিবানিশি ইন্তিজার ॥
হাসি খুসি নাই তার মনে সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো
এগো লাজ ভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥
যার গলে পিরীতের ফাঁসি সে হয় সকলের দাসী গো
এগো লোকের নিন্দন পুষ্প-চন্দন
অলঙ্কার পরাইছে গায় ॥
প্রথমকু পিরীতে মজা দ্বিতীয় পিরীতে সাজা গো
এগো তৃতীয়ে পিরীতে রাজা
রঙ্গ খুসী বেসুমার ॥
শীতালং ফকিরে বলে প্রেমের মালা যার গলে গো
এগো তারা কেগুরের কথা নাহি শুনে
কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার ॥

৯৮। **শেখ কবির** ধানশী (বেলাবলী) শ্রীরাধার রূপ

অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজরাজ গমনী ধনি ধনি ॥ ধু ॥
কাজলে রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে।
ভ্রমরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কন্ধর ধনি খিন অতি মাঝাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গিআ পড়িব জৌবনি।
সুন্দরি চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি।
অমিআ বরিষে জানি জৈছে শরদে পুরণ শশী ॥

---

[৯৮] সাঃ ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৮।

শেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে।
ছলতান নছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে ॥

৯৯। **ভিখন** বিভাস খণ্ডিতা

সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্ ঠাই ॥ ধ্রু ॥
কেমনে বনালে চূড়া শ্রবণে ঢুলিতেছে
মেলিতে নার দুটি আঁখি।
হবনা মথুরাগতি কি কব চূড়ার ভীতি (ভাতি ?)
শ্যাম অঙ্গে লাগিয়াছে সাখি ॥
কস্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি তাম্বুল
থুইয়াছিনু শিয়র উপরে।
হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে ॥
সেখ ভিখনে ভণে বড় দুঃখ রাইয়ের মনে
পাসরিলে পুরব পিরীতি।
আমার করম দোষে তুমি থাক অন্য পাশে
হৌক মেনে রাধার মিরিতি ॥

১০০। **সেখলাল** বরাড়ি বিরহ

শুন লো স্বজনি কিছুই না জানি
কি বুধি করিব আমি।
তরিতে নারিব দৈবে মরিব
নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥
শয়নে স্বপনে শ্যাম বঁধুর সনে
সুখে গিয়াছিনু নিদ।
পাজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা
দিয়া নিল সিঁদ ॥

---

[৯৯] ব্র ৪, পৃঃ ৩৫, র, পৃঃ ১৩; শু সমাচার, পৃঃ ৩০৮; পা, নং ১০; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ৯০।
[১০০] ব্র ৪, পৃঃ ৩৯; র, পৃঃ ১০; শু সমাচার, পৃঃ ৩০৮; পা, নং ৮।

শয়নে স্বপনে ঘরেতে পিরীতি
করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল
কিছুই না লয় মনে॥
তোমারে কহিনু সখি পিরীতির এই রীতি
সদাই পরবশ দে।
সেখলালে কয় যে জন তাহার হয়
সে বিনে জানিবে কে॥

১০১। **সদাইসাহ** বাউল

আমি করি গো মানা শ্যামরূপ নিরখি গো
জলে ঢেউ দিও না।
যদি রূপ ধরিতে চাও হে গো পরাণ সজনী
জলেতে নামিয়া গো তোরা ঢেউ দিও না॥
নাওয়ের মধ্যে পঞ্চজন একজন কাণ্ডারী গো
আমার তিনজন গুনারী।
মাস্তলেতে পাল চড়াইছি গো পরাণ সজনী
আমার মনাই ভাই বেপারী॥
সদাইসাহ ফকিরে কয় হইয়ে আউলাঝাউলা গো
সখী হয়ে আউলাঝাউলা।
আমি চড়াইছি রান্ধনের জুইত গো পরাণ সজনী
আমার ভাত রইল ফুটিচাউলা॥

১০২। **সমসের** বিরহ

* * *

ভ্রমে অভাগিনী ন চাহিলাম গুনমণি।
আসিল রে প্রাণবন্ধু না কৈলাম দরশন
ধরি পড়শির বোল। (হায় অভাগিনী।)

[১০১] রাগ-মারিফত, পৃঃ ২২। [১০২] ঐ ৬, পৃঃ ৩২।

বন্ধুআ নাগর গুণের সাগর
গোপত পরশ হার। (হাম্ অভাগিনী।)
পুরাণ পিরীতি, ছিল জুথ ইতি
সেই সব লাগে ধান্ধা॥ (হাম্ অভাগিনী।)
এবে দিনে দিনে চিত্ত বিঁধে ঘুণে
জীউ রহে মাত্র বান্ধা। (হাম্ অভাগিনী।)
কহে সমসেরে গুণের সাগরে
এখনে বন্ধরে পাম্। (হাম্ অভাগিনী।)
মনের আগুনি কহিয়া কাহিনী
চরণে মিশিয়া যাম্। (হাম্ অভাগিনী।)

১০৩। **সর্ফতোল্লা** গীত-সারঙ্গ বংশী

ও মন দেখরে! সতত মুরলী ফুকে কে॥ ধু॥
নন্দিয়া কিনারে কদম্ব শিখড়ে
শুন মুরলীর স্বরে।
হারাই এ জ্ঞান ছটফট প্রাণ
রহিতে না পারি ঘরে॥
শুনিতে মুরলী ছাড়ি গৃহবাড়ী
স্থির নহে নারীর চিত।
হেন হি মাধুরী সে বাঁশীতে ভরি
সদা গাহে কেন গীত॥
মুই তো অভাগী ঋতুসঙ্গী লাগি
নিকলিতে নাহি পারি।
গৃহকর্ম্ম ছাড়ি সঙ্গে আর চারি
তার ভয় করি নারী॥
দেয়ারিয়া ঘরে ননদিনী ডরে
শাশুড়ী কালের কাল।
সতিনীর জ্বালা সদা মুখ কালা
বিষ প্রিয় হৈল জ্বাল॥

[১০৩] সাহিত্য-সংহিতা, ১৩০৮ আষাঢ়, পৃঃ ১৮২।

সদা মনে দুখ গৃহে নাহি সুখ
পড়শী হইল অরি।
কহিতে লাঘব নাহিক বান্ধব
সতত এ দুঃখে মরি॥
সকল হারাই পন্থ নাহি পাই
গুরুবিত লক্ষ্য আর।
সেই পদ বিনে লক্ষ্য ত্রিভুবনে
সেই বস্তু নাহি সার॥
কাতর কিঙ্করে ডাকে বারে বারে
সাহা আলিরাজা পায়।
সারঙ্গের স্বরে কান্দিয়া নির্ভরে
হীন সর্ফতোল্লা গায়॥

১০৪। **সালবেগ** মিলন

বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন
বায়ে অতি অনুপাম রে।
মৃদঙ্গ চঙ্গ উপাঙ্গ সুমধুর
সপ্তস্বর তিন গাম রে॥
কোই নাচত তাল বজায়ত
নাচত শ্যামা শ্যাম রে।
আনন্দে তরঙ্গিত বহই যমুনা
এরূপ সখি সুখ ধাম রে॥
নব নাগর কান্ত রাধা তরুণী
নব জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী॥ ধ্রু॥
মোহিত নারদ সুর-নর-মুনি
মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে।
চাঁদ কিরণহি বিকসি কুমুদিনী
শোভিত সুঙ্গ সরোবরে॥

[১০৪] পদরসসার; অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃঃ ১৩৯।

হংস সারস তব কি তাণ্ডব
ডাহুকি শবদ মনোহরে।
সালবেগ প্রিয় নিরখি লাবণি
বরণি নহি কিছু যাত রে॥

১০৫। **সিরতাজ** তুহি—সিন্ধুরা বিবিধ

সই সই কহিতে খাথার পিআর বেভার
শুন প্রাণ সইরে॥ ধুঃ॥
সই সই কি মোর বান্ধন কি মোর বান্ধন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুনে বনেতে যাইমু
রাখিমু সোআমীর খোঁটা॥
সই সই গাছে ধরে ফল নারাঙ্গি কমল
বাদুরে চুসিআ খাএ।
আন্ধার সোআমী হালিআ গোআর
শুতিলে সে নিদ্রা জাএ॥
সই সই যাহার সোআমী রসিআ নাগর
সে নারীর কিসের দুঃখ।
দিনের পাপখানি দিনেতে খণ্ডাইব
দেখিয়া সে চান্দমুখ॥
সই সই বাপ না মাএরে কি দোষ দিমুরে
কুল চাহি দিল বিহা।
হাতে হাতে ধরি গলাএ বান্ধি দড়ি
সাগরে ডুবাইল নিআ॥
সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোআমী হাসিআ ন বোলাএ
মুঞি অপরাধী তুসি (দোষী)॥

---

[১০৫] সম্মিলন, ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮৩।

সই সই ন জানি কি দোষে পিআ মোরে রোষে
নিদআ হৃদএ পিউ।
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ॥

১০৬। **সৈরচান্দ** ললিত দানলীলা

পন্থ ছাড় ঘরে যাই রে, নিলাজ কানাই॥ ধু॥
মাথায় পসরা করি চলিছ গোপালের নারী
কোথায় তোর ঘর বাড়ী?
মথুরাতে যাইতে চাহ কিছু দান দিয়া যাহ
অনাদানে ছাড়িতে না পারি॥
হওম্ মুই গোপালের নারী গোকুলেতে ঘর করি
মথুরাতে করি হাটবাট।
চিরকাল এই পন্থে না দেখিছি দান লৈতে
আজু কেনে নিরোধিছ বাট॥
তুমি তো নন্দের সুত কর্ম্ম কর অদভুত
পন্থ মধ্যে কর বাটোয়ারি।
রাজা আছে কংসাসুর বড়াই করিব চুর
পাছে দোষ না দিও আমারি॥
হীন সেরচান্দের বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী
ভজ গিয়া কানু গুণসার।
তরিতে পাতকী লোক না ভাবিও মনে দুখ
কানু বিনে গতি নাহি আর॥

১০৭। **সৈয়দ আইনদ্দিন** রামকেলি—মাথুর

মরম দগধে প্রেমবাণে!
বন্ধুয়ারে শরীর ভেদিল কামবাণে॥ ধু॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।

---

[১০৬] ঐ ৩, পৃঃ ২২।[১০৭] ঐ ৩, পৃঃ ১২

তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীননাথে ॥
তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্ক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা ॥

১০৮। **সৈয়দ আলী** দেহতত্ত্ব

গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার দরশন।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ॥
কিতাব কোরাণ পড়ি না পাই তার দরশন।
"ওজিফা"তে শুদ্ধ বচন চিন্‌লায়নারে অজ্ঞান মন ॥
খানা পানি খাইয়া থাকে নিশাভাগে হয় চেতন।
রূপের ঘরে রূপ জলতেজে বিনা চক্ষে দরশন ॥
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ।
আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিফিনীতে দরশন ॥

১০৯। **সৈয়দ জহুরুল হুছেন** ভৈরবী বংশী

হেরলো সজনী কদম হেলিয়া,
ত্রিবেণীতে বাজে বীণা প্রাণবন্ধু রসিয়া।
মুই গেল যমুনার জলে, কুম্ভটী সঙ্গে নিয়া।
(প্রাণবন্ধু রসিয়া)

[১০৮] রাগ মারিফত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯।
[১০৯] জাওয়াহির, নং ১৭।

আচম্বিতে বংশী ধ্বনি গেল হৃদে বিন্ধিয়া,
বাঁশী না হয়, ভেরী না হয়, সর্পে দিল ছুয়া,
ঢলিয়া পড়ে কাঙ্কন বালা আপনি আপন হারিয়া

(প্রাণবন্ধু রসিয়া)

উঝা গুণির সাধ্য কি হয় বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া,
যে দিয়াছে বিষের দারু সে যদি না যায় নিয়া।

(প্রাণবন্ধু রসিয়া)

তোমার নামে সুরধুনী, উজান চলে নাচিয়া,
যে নামিল মুক্তি নিল ঐ নদীতে ডুবিয়া।

(প্রাণবন্ধু রসিয়া)

জহর বলে দিনত গেল ভাবে ভাবে চলিয়া,
জীতে না দেখিলেরে প্রাণ কি ভরসা মরিয়া।

১১০। **সৈয়দ নাসিরুদ্দীন** দীপক শ্রীকৃষ্ণের রূপ

আলো রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই।
ঐরূপ রসিয়ার সঙ্গে কে দিব মিলাই ॥ ধু ॥
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।
অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জর জর ॥
তরুয়া কদম্ব তলে ঐরূপ রঙ্গিমা।
নানারস বাঁশীর স্বনে দিতে নারি সীমা ॥
কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি ॥

১১১। **সৈয়দ নিয়ামত** বাউল

আপনা জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না ভাবতে আছ পরের দায়।
দিন যায় মন তুমি বসিয়া রইলে কার আশায় ॥
মনরে মায়া জালে বন্দি হইয়ে বেড়ি দিলে আপন পায়।
বেড় লাগাই মাকড়ের আশে ঠেক্‌বেরে আউলা সুতায় ॥

---

[১১০] রূঃ ৩, পৃঃ ১৮। [১১১] রাগ বাউল, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬।

মনরে পুত্রজন স্বজন হইলে ভালবাসে পিতামাতায়।
আপনা শরীর কাহিল হইলে ডাক দিয়া যমকে বিলায়॥
মনরে শ্রীনাথপুরে সন্ধ্যা হইলে চলি যাবে মথুরায়।
চোখের বাতী নিবে গেলে কান্দ্‌বেরে মনের খেদায়॥
মনরে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়।
সঙ্কটতারণ আমার মুর্শিদ শ্যামরায়॥

১১২। **সৈয়দ মর্ত্তুজা [ক]** বেলাবেলী নিবেদন

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি!
কোন্ শুভদিনে দেখা তোর সনে
পাশরিতে নারি আমি॥ ধু॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥

১১৩। **সৈয়দ মর্ত্তুজা [খ]** সিন্ধুরা মান

সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান।
আড় নয়ন কোণে হানিলে মদন-বাণে
জীউ ধরিয়া মোরে টান॥ ধু॥

---

[১১২] ত্র ১, পৃঃ ৭; র, পৃঃ ১৭; তরু, ২৯৫৭ পদ; বৈষ্ণবপদাবলী (C.U.), পৃঃ ১৩৩; কীর্তন পদাবলী, পৃঃ ৪১৯; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, পৃঃ ১৪৬; পা, নং ১৩; কাব্য-মালঞ্চ, পৃঃ ২৮। [১১৩] পা, নং ১১; কাব্যমালঞ্চ, পৃঃ ২৯; তাল-নামা; ত্র ১, পৃঃ ৬; র, পৃঃ ১৫; হু সমাচার, পৃঃ ৩০৬।

একে তোমার গোরা গা না সহে ফুলের ঘা
বায়ে হেলিছে সব অঙ্গ।
দেখিয়া তোমার মুখ ব্যথায় বিদরে বুক
কাম-সাগরে উঠে রঙ্গ॥
তোমার যৌবনে আমি ঝাঁপ দিব মনে জানি
যদি কৃপা করহ আমারে।
বুঝিয়া আপন কাজ পার কর মোরে আজ
চড়াইয়া নৌকার উপরে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে কেবল তোমার শরণ॥

১১৪। **সৈয়দ শাহনূর** রাগ—রোদন বিরহ

কত দুঃখ সইব শরীরে রে।
ও প্রাণ বন্ধু! কত দুঃখ সইব শরীরে॥
তুষির মাঝে অনল দিলে বন্ধু ধীরে ধীরে জ্বলে
যদি লাকড়ির আগুন হৈত জ্বলি পুড়ি নিভি যাইত।
বন পুড়ে সয়ালে দেখে ও বন্ধু মন পুড়ে কেউ না দেখে
বন্ধু মনের অনল জ্বলে নিরবধি রে।
মনের আগুন নিভাইলে নিভে না রে॥
তুই বন্ধু ভাড়িলে মোরে ও বন্ধু ঘরের মাঝে অনল দিলে।
ও বন্ধু চাইয়া দেখ ঘরপোড়া পালা রে।
তুই বন্ধু চিকনকালা আমি ঘরের পোড়াপালা
বন্ধু চারিধারে জ্বলিয়া অঙ্গার রে॥
ছৈয়দ শাহনূরে বলে ও বন্ধু আমার তনে অনল দিলে
ও বন্ধু নিভাইতে নি পার মনের অনল রে॥

১১৪] শ্রীভারতী, ১৩৫০ আশ্বিন, পৃঃ ৯৬।

১১৫। সৈয়দ সুলতান আশোয়ারী বা গৌরী মিলন

নন্দ আসি জয় দেও রে আমার গোপাল
আইসে ঘর ॥ ধুঃ ॥
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই।
আজ্ রাধার শুভদিন মিলিল কানাই ॥
অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে।
নানা রূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ॥
জল নাহি কলসে যমুনা বড় দূর।
চলিতে না চলে রাধার চরণে নূপুর ॥
ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও।
গঙ্গার জল সাঁচরি (?) বক্ষেরে করি বাও॥
কহে সৈয়দ সুল্‌তানে মনেতে ভাবিয়া।
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ॥

১১৬। সোন্দর ফকীর রাগ-মালসি রূপ

চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া ॥ ধু ॥
এক হাতে বাজুবন্দ আর হাতে বাঁশী
সোন্দর ফকীরে কহে হামো পরবাসী।

১১৭। হবিব আশাবরী শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল।
কপালে চন্দন ফোঁটা বিনোদ টালনি ঝোঁটা
গলে শোভে বকুল মাল ॥ ধু ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপাম।
করেতে মোহন বেণু নির্ম্মল কোমল তনু
অতসি কুসুম জিনি শ্যাম ॥

---

[১১৫] দ্র ৬, পৃঃ ৪৬। [১১৬] মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, নং ৩০৫। [১১৭] দ্র ৬, পৃঃ ৩৭ দ্র. পৃঃ ৪; পা. নং ৩; কাব্য-মালঞ্চ. পৃঃ ৩৯।

কটিতে পীতাম্বর দেখিতে মনোহর
মুকুন্দ মোহন যত্নরায়।
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলে সুনাদ মুরলী পুরে
তিন লোক মোহিত যায়॥
ফকীর হবিব বলে কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মন (মোর ?) করে হিয়া কানুর সমুখে থুইয়া
নিরবধি দেখহুঁ সদায়॥

১১৮। হাছনরজা বিরহ

এগো সুন্দরী দিদি কথা শুনিয়া যা গো;
প্রাণবন্ধু মোর কোথা আছে বলিয়া মোরে দে গো॥
না হেরিয়া বন্ধু মম হইয়া আছি মৃত সম।
এখনে কি করি করি করি গো॥
করিয়া আমার মন চুরি কোথা গেল প্রাণহরি।
ধরতে গেলে না যায় ধরা কেমনে তারে ধরি গো॥
হাছনরজা বলে দিদি মনকে আমি কত সাধি।
মন হইয়াছে বিবাদী সে বিনে মানে না গো॥

১১৯। হাসমত কোড়া বিরহ

বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী, তোরা দেখ্‌লো সখি রে,
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী। ধু।
আইল বসন্ত রিত, ফুল ফোটে সুললিত,
মধু লোভে গুঞ্জরে ভ্রমরা।
কামিনী পরশে ভানু, কামে অঙ্গ দহে তনু,
বৃন্দাবনে ফুটিছে কমলা॥
আইল শিশির-বৈরী, অঘোর গম্ভীর করি,
নিশি দিশি নাহি মেলে আঁখি।

---

[১১৮] হাছন উদাস, পৃঃ ৮৩। [১১৯] ঐ ৩, পৃঃ ৩৩

দাতুরী কামদ গায়, ত্বরিতে নয়ন ধায়,
শুনি কহে ব্রজ ভানুর সুতা ॥ (?)
অঘোর সাঁঝুয়া বেলা, কি বোল বোলিয়া গেলা,
যদি না আসিবা ছিল মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এত দুঃখ কেনে দেও মোরে ॥
বহুল যতন করি, শয্যা সাজাইলাম নারী,
নানান সুগন্ধি পুষ্প দিয়া।
বাটাতে তাম্বুল ভরি, অষ্ট অলঙ্কার পরি,
সব নিশি জাগিলাম্ বসিয়া ॥
যখনে পিরীতি কৈলা, রাত্রিদিন আইলা গেলা,
ভিন্ন ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিয়া লাজ,
এবে সে না চাহ চক্ষুর কোণে ॥
তোমার কঠিন হিয়া, আনলেতে কাষ্ঠ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া।
অধীন হাসমত বলে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবারহ প্রেমরস দিয়া ॥

১২০। হাসিম বিভাস আক্ষেপ

ফুলের মালা গলে রে চম্পার মালা দোলে।
রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে ॥ ধু।
সুক্ষেণে গাঁথিয়াছে মালা মাঝে মাঝে ফুল।
ফুলের মালা গলে দিয়া নিল জাতি কুল ॥
শেফালি ফুলের মাঝে গন্ধরাজ ফুল।
ফুলের মহিমা জানে নন্দের ঠাকুর ॥
হীন হাসিমে বোলে ফুলের মালা গলে দোলে।
রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে।

---

[১২০] ব্র ৪, পৃঃ ২

১২১। ছৃছন বাউল

গউর চান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥
তোমারে না দেখি আমার দেহা জ্বলি যায়॥
হায়স খামসার মুখে লাগাম দিলায় না।
দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না॥
কালা ধলা লীলাচান্দ তীরিপুন্নীর ঘাট খেলা।
যৌবতীরে ফাকি দিয়া রূপ দেখাই গেলা॥
দিয়া চান্দ ফাঁকি আমারে গেলা জলের ঘাট রাখি।
না দেখি তোমার রূপ উড়ে দেহার পাখী॥
সমুদ্দুরের ফেনা হই রেহু হই ঘুরি।
কতদিন ঘুরিহু চান্দ যৌবতীর যৌবন গেল ঝরি॥
ছৃছন বলে পীরিতি বিষম লেটা মিটে না নছিবের লেখা।
দয়ার চান্দে দয়াধরি দিবনি মোরে দেখা॥

[১২১] প্রেমসতী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২।

কবি-পরিচয়

১। অজ্ঞান—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ভারতবর্ষের ১৩২৫ পৌষ-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

২। আকবর আলী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'গুধরাইল' পরগণার 'মামদপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্ব নিবাস হবিগঞ্জের 'তরফ' ছিল। পিতার নাম আবদুল আজিম। ইহার নাম ছিল 'সরপউদ্দিন', কিন্তু পরে ইনি 'আকবর আলী' নামে প্রসিদ্ধ হন। কবি প্রত্যেক গানের ভণিতায় নিজকে 'ছাবাল আকবর আলী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবি শ্রীহট্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক কবি 'ছৈয়দ শাহনূরের' পুত্র 'শাহজহরআলীর' শিষ্য ছিলেন। ইহার রচিত 'এস্কে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জান' ও 'যৌবন-বাহার'-নামক তিনখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক মোট ২১টি গান আছে। কবির বংশলতা—জাফর আলী—মেন্দিকামাল—আবদুল আজিম—সরপউদ্দিন বা ছাবাল সা আকবর আলী। তুল—

'সাহা সরপউদ্দিন নাম রাখিলা আমার।
আকবর আলী ছাবাল সাহ নাম করিলা প্রচার॥
ছৈয়দ সাহনূরের বেটা সাহা জহর আলী নাম।
তান খেদমতে আমি অধম গুলাম॥'

('এস্কে দেওয়ানা' পৃঃ ২২)

৩। আছদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ 'সম্মিলন', ১৩২৪ বাং ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইপদে কবি তাঁহার গুরু 'আএনদ্দিনের' উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'মন মনোরথ হইল পুর্ণিত
সহাএ সাহা আএনদ্দিন!'

আছদ্দিনের অনুরূপ 'মনৌঅরের' গুরুও 'আএনদ্দিন'। উভয় কবি এক গুরুর শিষ্য হইলে সমকালবর্ত্তী অনুমান করা যাইতে পারে।

৪। আবঝল—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত দুইটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' চতুর্থ খণ্ডে ও একটি পদ 'ভারতবর্ষ',

১৩২৫ বাং পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচিত একটি পদে 'ছৈয়দ পেরোজ' নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তুল—

'ছৈয়দ পেরোজ (ফিরোজ?) সাহা, সুধাময় অবগ্রহা (?)
ভজসখি ? স্মরঙ্গ চরণ।' (ব্র ৪, পৃঃ ২৮)

৫। আবদুল বারী—ইনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কাজিপাঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ৩৯টি গান-সম্বলিত 'আবেগ' প্রথম খণ্ড, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে এবং ৪৫টি গান-সম্বলিত 'আবেগ' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত আছে।

৬। আবদুল মালী—পরিচয় অজ্ঞাত; ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলমান কবির পদ-সাহিত্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

৭। আবদুল মালীক [হেকিম]—ইনি শ্রীহট্ট সহরের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৮টি গান-সম্বলিত 'প্রেমের দেওয়ানা', প্রথম খণ্ড, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

৮। আবাল ফকির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। আবুল হুছন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার 'পাগলা'র অন্তর্গত 'রাহির চর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১৬টি গান-সম্বলিত 'পিরিতের ঢেউ' শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের ৬টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। কবি 'ছুলালী' পরগণার অন্তর্গত 'খাসিকাহন'-নিবাসী 'সাহা জানউল্লা' পীরসাহেবের শিষ্য ছিলেন। তুল—

'আবুল হুছনের বাণী, জানউল্লা গুরু জানি
খাসিকাহন পরগণা ছুলালী।' ('পিরিতের ঢেউ', পৃঃ ১)

১০। আমান—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১১। আরকুম—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'খিত্তা' পরগণার 'ধরাধরপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তুল—

'ভিক্ষার ফকিরী হইয়া ফিরি ঠাই ঠাই।'
('হকিকতে সিতারা', পৃঃ ৬৬)

ইহার মুর্শিদের নাম ছিল 'সাহা আবদুল লতিফ'। যথা—

'হজরত সাহা আবদুল লতিফ নিজের বেলাত দিয়া
পাগল আরকুমের নৌকা দিয়াছইন ভাসাইয়া।
('হকিকতে সিতারা' পৃঃ ৩১)

ইহার রচিত ৯৪টি গান-সম্বলিত 'হকিকতে সিতারা' গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থের বহু পদে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

১২। আলাওল—ইনি ফরিদপুর জেলার 'ফতেয়াবাদ' পরগণার 'জালালপুর' নামক স্থানের অধিপতি 'মজলিস কুতুবের' একজন সচিবপুত্র ছিলেন। যথা—

'মজলিস্ কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর
তাহান অমাত্যসুত মুঞি সে পামর॥' ('সয়ফুল মুলুক')

আলাওলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতী'। ইহা প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি 'মালিক মোহাম্মদ জয়সী' প্রণীত 'পদুমাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ইহা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত হয়। 'পদ্মাবতী' ব্যতীত ইহার রচিত ও অনূদিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান জানা যাইতেছে, যথা—(১) দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ রচনা 'সতীময়নার' উত্তরাংশ—১৬৫৮ খ্রীঃ; (২) ফারসী 'সয়ফুল মুলুক বদীউজ্জমাল' গ্রন্থের প্রথমাংশের অনুবাদ—১৬৫৯ খ্রীঃ; ঐ শেষাংশের অনুবাদ—১৬৬৯ খ্রীঃ; (৩) পারসিক মহাকবি 'নেজামী গজনবী'-রচিত 'হপ্ত পয়করের' বঙ্গানুবাদ—১৬৬০ খ্রীঃ; (৪) পারসিক কবি 'ইউসুফ গদার' 'তোহ্‌ফা' বা তত্ত্বোপদেশ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—১৬৬৪ খ্রীঃ; (৫) পারসিক মহাকবি 'নেজামী গজনবী'-রচিত 'সেকান্দর নামার' বঙ্গানুবাদ—১৬৭১ খ্রীঃ। এতদ্ব্যতীত কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কয়েকটি গানও রচনা করেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল-সঙ্কলিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ডে আলাওল-রচিত ৫টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে। এই পাঁচটি পদের মধ্যে একটি 'আলো' পত্রিকায় ও অপর একটি 'সাহিত্য সংহিতায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। আলাওল তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

১৩। আলিমদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪। আলিরাজা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'বাঁশখালি' থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ 'কানুফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। ইঁহার গুরুর নাম ছিল 'কেয়ামদ্দিন'। কবি-রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে এবং বহু সঙ্গীতে গুরুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। যথা—

'সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু বংশীনাদে বশ।
আলিরাজা কহে বাঁশী অমূল্য পরশ ॥'

ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের সংবাদ জানা যাইতেছে—(১) 'ধ্যানমালা'-সঙ্গীতগ্রন্থ, ইহাতে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তালের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং দৃষ্টান্তস্থলে বিভিন্ন কবির এবং স্থলভেদে স্বরচিত এক একটি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে ; (২) 'সিরাজ কুলুপ'—দরবেশী গ্রন্থ ; (৩) 'জ্ঞান-সাগর'—দরবেশী গ্রন্থ ; (৪) 'যোগ কালন্দর'—তান্ত্রিক মতের গ্রন্থ এবং (৫) 'ষট্‌চক্রভেদ'। কবি-রচিত ৪৬টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাপদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি পদ 'আলো', 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' স্থান পাইয়াছে। ইঁহার রচিত দুইটি শ্যামাসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র ও শিষ্য 'সর্ফতোল্লা' ও 'এর্শাদুল্লা'-রচিত সঙ্গীত বর্ত্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৫। আলিমিঞা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'সুলতানপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৬। আসরফ আলী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'আখালিয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ৩৬টি গান-সম্বলিত 'সমস্থুল ইছলাম্ আসিকে বারাম' গ্রন্থ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

১৭। ইরকান—ইনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার লোক ছিলেন। ইঁহার রচিত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আসরফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগবাউল, প্রথম ভাগ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮। ইরপান সা—ইনি কাছাড় জেলার 'উধারবন্ধ' পোষ্ট অফিসের অধীনস্থ 'লাঠি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ৩১টি গান-সম্বলিত

'মারীফতি উদাস বাউল' গ্রন্থ শিলচর প্রেসে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ৫টি সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

১৯। উছমান—ইনি শ্রীহট্ট জিলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'ঢাকাদক্ষিণ' পরগণার 'সুনামপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৫৮টি গান-সম্বলিত 'হকিকতে মারিফত' গ্রন্থ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। কবি নিজের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

পিতার নাম মহাম্মদ আচিম জানিবায়॥
ঢাকাদক্ষিণ পরগণায় ঠিকানা আমার।
থানা গোপালগঞ্জ জান শ্রীহট্ট সহর।
সুনামপুর মৌজায় জান গরীবের ঘর॥'

('হকিকতে মারিকত', পৃঃ ৩৯)

২০। উদাসী [ওরফে—ইদ্রিছ আলী]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গমূলক ৬টি গান 'বাংলার শক্তি' পত্রিকার ১৩৪৬ বাং আশ্বিন ও ১৩৪৭ বাং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২১। উম্মর আলী—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পরগণা 'বাদে কুমড়ি শাইলের' (চুড়খাই) 'খারাভরা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'এস্কের বাগান' গ্রন্থ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

২২। এবাদোল্লা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৩। এর্শাতুল্লাহ—ইনি কবি আলীরজার পুত্র, নিবাস ওশখাইন, অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের কবি। ইনি পিতার নিকট দীক্ষিত, ইহার রচিত ৬টি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে ; তন্মধ্যে মাত্র একটি পদ কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক। :—

"আলীরজা পায়ে তাহান নন্দন ভণএ" (পদ সং ৩৭৫)
"আলিরজা গুরু পন্থের তরু" (পদ সং ৩৭৪)

২৪। ওয়াহিদ (আবদুল)—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগণার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৪৬টি গান-সম্বলিত 'তত্ত্বকুলিয়া প্রেমের মিঠাই' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার উল্লেখ আছে।

২৫। ওহাব [ফকির]—ইনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 'হাওলা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রামের জনৈক ছাত্র মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়কে ওহাবের পদ সংগ্রহ করিয়া দেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে ওহাবের দুইটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬। ওহাব [মৌলবী শাহ আব্‌দুল ওহাব]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'গোপালগঞ্জ' থানার অন্তর্গত 'বরায়া' পরগণার 'ফুলবাড়ী' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'হাসর-তারণ' ও 'ভবতারণ'-নামক দুইখানি সঙ্গীতগ্রন্থের সন্ধান জানা যায়। প্রথম গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি আবদুল কাদির' নামক জনৈক পীরের শিষ্য ছিলেন। তুল—

'আবদুল কাদিরের বালক ত্রিজগতে নাই লখ
রহিলু কেবল মুর্শিদের দিকে চাইয়া।' ('হাসর-তারণ', পৃঃ ২)

২৭। কবীর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ গৌর-পদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পদটিই রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে ও ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবীর ও শেখ কবিরকে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন।

২৮। কমর আলী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'করুলডেঙ্গা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইহার স্বদেশবাসী হাড়িদিগকে ইনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহার রচিত ১৫টি পদ ও 'রাধার সংবাদ ঋতুর বারমাস'-শীর্ষক বারমাসীটি ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদসমূহের মধ্যে দুইটি পদ 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত আরও বহু পদ 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-সঙ্কলয়িতা ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই-সকল পদ 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঐ খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই।

২৯। কালাশা [ওরফে—আবদুল রজ্জাক]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত ' আতুয়াজান' পরগণার 'ধাইপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৭৪টি গীত-সম্বলিত 'রত্নসাগর, প্রথম খণ্ড' ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

৩০। কালীপ্রসন্ন [ওরফে—মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন]—ইনি কলিকাতার শিয়ালদহের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত পরমার্থ-ভাবপূর্ণ বহু শাক্ত ও বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া ইনি পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক 'কালীপ্রসন্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। 'কালীপ্রসন্ন' নামটি এস্থলে মহাশক্তির প্রসন্নতার সুযোগ্য পাত্র হিসাবেই মুন্সী সাহেবের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। মুন্সী সাহেবের এই নূতন নাম গ্রহণের পরে রচিত প্রত্যেক সঙ্গীতে 'কালীপ্রসন্ন'-ভণিতা দৃষ্ট হয়।

৩১। কাসিম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইঁহার রচিত ৫টি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি পদ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক।

৩২। খতিসা [ওরফে—আবদুল মজিদ]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'মুন্সী-বাজারের' অন্তর্গত 'বলরামপুরের' অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ২৬টি গীত-সঙ্কলিত 'আসিক নামা' হবিগঞ্জ, সীতারাম প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হয়। কবি স্বরচিত সঙ্গীতের ভণিতায় সর্ব্বত্র নিজেকে 'খতিসা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তুল—

'অধমের তখল্লুছী নাম জান খতি ॥
খাতায় নিমগ্ন মুই পাতকীর মন।
খতিসা রাখিনু নাম 'তাহার কারণ ॥'

('আসিক নামা', পৃঃ ১)

কবি নিজ ঠিকানা নিম্নোক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'ঠিকানা জানিও মোর বলরামপুর।
পোষ্টাফিস্ মুন্সীবাজার সোয়া মাইল দূর ॥
শ্রীহট্ট জিলার মাঝে কমলগঞ্জ থানা।
ভানুগাছ ষ্টেশন তথায় পরগণা ॥'

('আসিক নামা', পৃঃ ১৭)

৩৩। খলিল—পরিচয় অজ্ঞাত। ইঁহার রচিত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ মারিফৎ', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত 'চন্দ্রমুখী' নামক পুস্তকে মিশর-রাজপুত্র 'গোল হুনাওর' ও গন্ধর্ব্ব-রাজকন্যা 'চন্দ্রমুখীর' প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শেষে ইঁহার কয়েকটি বাউল, নাচাড়ী ও ধামালী গান মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন।

৩৪। খাতাসা—[ফকির]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ বাউল', প্রথম ভাগ, গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫। গয়াজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত তিনটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৬। গরীব খাঁ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩৭। গোলাম হুছন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত কয়েকটি সঙ্গীত 'শ্রীহট্ট মুস্‌লিম সাহিত্যসংসদে' রক্ষিত হস্তলিখিত 'গীতসংগ্রহ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন।

৩৮। গোলাম হুছন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত কয়েকটি গান 'আবাহন' পত্রিকার দুইটি প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন অসমীয়া ও বাংলা প্রায় অভিন্ন। এই গানের ভাষা বাংলা কি অসমীয়া স্থির করিতে না পারিয়া গান-সংগ্রাহক ইহার ভাষানির্ণয়ের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পণ করিছেন। এই গানের ভাষা আমার নিকট বাংলা বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। ইহার একটি গান বর্ত্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইল। তুল—

"কিন্তু গীতর মাজত হরি, রাম, কানাই আদি নামর সংযোগ আছে। পুথিখনির লিখক কোনোবা বঙ্গালী নে অসমীয়া মানুহ, বা এই পুথিখনি পুরণি অসমীয়া ঠাচত লিখা নে বঙ্গালী ঠাচত লিখা তাক বিশেষজ্ঞ সকলে নির্ণয় করিব।" ('অসমীয়া মুছলমানী পুথি'—ছাহ ছৈয়দ হাছানআলী-লিখিত, আবাহন, আঘোন ১৮৫৪ শক, পৃঃ ২২৩-২৪)।

৩৯। চাঁদকাজী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, যে কাজী শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তন নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল চাঁদকাজী। কিন্তু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে কীর্ত্তন-নিবারক কাজীর নাম গোরাই কাজী।

৪০। চামারু—ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার লিখিত একাধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের একখানি পাণ্ডুলিপির নানাস্থানে ইনি নিজের

নাম ও ঠিকানা লিখিয়া গিয়াছেন। "লিখিতং শ্রীচামারু পণ্ডিত সাং ছুলতানপুর।"

৪১। চাম্পাগাজী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'ছতর পটুয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'রাগনামা', 'তালনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পিতার নাম ছিল আবদুল কাদের। তুল—'আঁবদুল কাদের সুত চাম্পাগাজী ভণে'। ইহার রচিত দুইটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪১। (ক) ছহিকা বানু—শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার রামপাশা গ্রামে ইহার জন্ম। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মরমী কবি হাছনরজা সাহেবের বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন। হাজী ছহিকা বিবিকে শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট শহরের কুয়ার পার মহল্লায় এই মহিলার বসতবাটী ছিল। তাঁহার রচিত ছহিকা-সঙ্গীত ১৩১৪ বাং প্রথম প্রকাশিত হয়। "আল্-ইসল্াহ্"-পত্রিকার ১৩৬৬, কাত্তিক-পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস লিখিত "শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি মরহুমা ছহিকা বানু" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার রচিত "ছহিকা-সঙ্গীত" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ৮টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪২। ছাওয়াল শা [ওরফে—মহম্মদ রমজান আলী]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'গদাছন নগর' পরগণার অন্তর্গত 'বাঘারুক' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৬৯টি গীত-সম্বলিত 'তরিকতে হক্কানী' গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়।

৪৩। জালাল উদ্দি—ইনি ময়মনসিংহ জেলার পোষ্টাফিস 'আওজিয়ার' অন্তর্গত 'সিংহের গাও' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত কয়েকটি বাউল-সঙ্গীত 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪৪। তস্ম [ইব্রাহিম]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'কানাইঘাট' পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত 'বাড়ই আইল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ৬১ বৎসর বয়সে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের শেষ শুক্রবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র ছিদ্দিকুর রহমান সাহেব মোট ৩৫টি পদযুক্ত এক পুস্তিকা 'নূরের ঝঙ্কার', প্রথম খণ্ড, নামে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। উক্ত 'নূরের ঝঙ্কারের' ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, তস্ম মোট ৩০৮টি গান রচনা করিয়াছিলেন। তস্ম—

'তুষ্ণা' শব্দ-জাত। এই কবি-রচিত অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যে ভগবান্‌কে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৪৫। তুফানদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ 'সম্মিলন', ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৬। দানেশ—ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। ইনি এবং রাগমালা-রচয়িতা কাজী দানীশ অভিন্ন কি না বিচার-সাপেক্ষ। কাজী দানীশের উল্লেখ তাঁহার সমসাময়িক কবি মোহম্মদ মুকিমের রচনায় আছে—

"শ্রীযুক্ত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া।"

কাজী দানীশের অন্যতম শিষ্য পদকার বক্সা আলী।

৪৭। দুলামিঞা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৮। দৈখোরা [ওরফে মুনিব উদ্দিন]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'বাহাদুরপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাধক ও কবিরূপে সকলের শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। স্বর্গত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অধুনালুপ্ত 'প্রভাত' পত্রিকার ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক-সংখ্যায় ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

৪৯। নওয়াজিস—ইহার রচিত ৮টি কবিতা মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পদ রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক, অপর একটি পদ কালী-সঙ্গীত। ইনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম মোহাম্মদ এয়ার। ইহার রচিত গুলে বকাউলি, জরওয়ার সিংহ, পাঠান প্রশংসা, হোসেন নৃপতির কীর্ত্তি প্রভৃতি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তদ্‌রচিত গুলে বকাউলিতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। ইহার রচনায় আলাওলের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

৫০। নজর মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

৫১। নজির—ইনি কাছাড় জেলার লোক ছিলেন। ইহার রচিত দুইটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫২। নশীরমামুদ—পরিচয় অজ্ঞাত। 'পদকল্পতরুতে' ইহার পদ স্থান পাইয়াছে। ঐ পদ ব্যতীত আরও একটি পদ রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে আছে। এই উভয় পদই ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইনি বঙ্গের নরপতি হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ।

৫৩। নাকিস্ত—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহা কাহারও নাম নহে। কবি নিজ নাম ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিনয়সূচক 'নাকিস্ত' অর্থাৎ 'অধম' শব্দের দ্বারা নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। 'নাকিস্ত'-ভনিতাযুক্ত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৪। নাছির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত দুইটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় নাছির, নাছির মহম্মদ ও নশির মামুদকে একই কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে—" 'নশির' ও 'নাছির' নামদ্বয়ে কেহ পার্থক্য কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। উচ্চারণভেদই এই পার্থক্যের হেতু। এই দুই কবিকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোন প্রমাণ নাই সত্য, কিন্তু রচনা-প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই দুইজনকে এক কবি বলিয়া ধারণা না করিয়া পারা যায় না।" আমি নাছির, নাছির মহম্মদ ও নশির মামুদকে পৃথক্ কবি অনুমান করিয়া তিনটি গান উদ্ধৃত করিয়াছি। এই-সকল সঙ্গীতের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য পাই নাই যাহার জন্য সকল সঙ্গীত-রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নশির মামুদের—'ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় অপর যে পদটি পাইয়াছেন, তাহাও চট্টগ্রামের কোন পুঁথিতে নাই। এমতাবস্থায় নশির মামুদ ও চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত নাছির ও নাছির মহম্মদকে এক ও অভিন্ন মনে না করিবার পক্ষে যুক্তি মিলিতেছে। কবি নাছির একটি পদে নিজেকে 'এতিম' ও অপরটিতে 'ফাজিল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫৫। নাশিরদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত দুইটি পদ ব্র ৩ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৬। নাসির মহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত তিনটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৭। নেমত হোসেন—ইনি দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার 'রাজনগর' থানার অন্তর্গত 'ইটা' পরগণার 'দুর্গাও' মৌজার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত দুইটি গান মোহম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৮। পাগল কানাই—আনুমানিক ১৮১০ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় কবি পাগলা কানাই যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার সদর থানার অন্তর্গত বেরবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা কুড়ান শেখ ছিলেন একজন গরীব কৃষক। কবি গ্রামের মক্তবে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন—

"লেখাপড়া শিখবো বলে
পড়তে গেলাম মক্তবে
পাগলা ছোড়ার হবে না কিছু
ঠাট্টা করে কয় সবে।"

কবি প্রথম জীবনে কিছুদিন আঠারখাদার চক্রবর্তীদের বেরবাড়ীস্থ নীলকুঠিতে ২৲ বেতনে খালাসীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। "তাহার বংশ বা অন্ত গৌরব ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর আর চরিত্রের অপূর্ব্ব বিনয়শীলতা। তাঁহার হিন্দু-মুসলমানের ভেদজ্ঞান ছিল না, সর্বত্র সমদৃষ্টি ছিল।" কবির একটি গানে 'ফকির নয়ান' নামক তার ওস্তাদের উল্লেখ আছে। যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, পাবনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিল। কবি পাগলা কানাই লালন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৮৯০।৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার রচিত ২৪০টি গান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ১২টি গান বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন।

৫৯। পাঞ্জশাহ—ইনি যশোহর জেলার শৈলকুপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খাদেম আলী খোন্দকার, ইনি স্ত্রী ও পুত্র পাঞ্জশাহসহ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যশোহর জেলায় হরিণাকুণ্ড থানার অধীন হরিশপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করেন। পাঞ্জাশাহ উক্ত গ্রামের হেরাজতুল্লা খোন্দকার নামক জনৈক সুফী পন্থী সাধুর নিকট দীক্ষিত হন। পাঞ্জশাহের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ "ইস্কি ছাদেকী গহর"। ইহার রচিত ৫৫টি গান 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'-শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬টি গান বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। ইনি ১৩২১ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৬০। পীর মোহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬১। ফএজর রহমান—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'জঙ্গলখাইন' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম আমান আলী। ইহার রচিত 'গোলশনে বাহার' গ্রন্থ তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শেখ মোহাম্মদ হাবিকুল বকর চৌধুরী-কর্ত্তৃক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থ-রচনা-কাল সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

'বাণ বামে গ্রহ স্থিতি ভুজবামে নিশাপতি
বাংলা এই সন বিরচিত।' (১২৯৫ বাং)
—('গোলশনে বাহার', পৃঃ ১৫)

এই গ্রন্থে একাধিক রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক গান আছে।

৬২। ফকীর শাহ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

৬৩। ফজল উদ্দিন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত 'জগন্নাথপুর' থানার 'তেঘরিয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার এবং 'ফজলুর রহমান' ও 'সুনামিয়া পীরসাহেব'-রচিত 'হজরত শাহ ছিদ্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইসমাইল তবকাতীর জীবন-চরিত' গ্রন্থ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে ফজল উদ্দিন-রচিত একাধিক রাধাকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৪। ফজলল্ হক সিকদার—ইনি ত্রিপুরা জেলার 'নন্দলাল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৫০টি গজল-সম্বলিত 'মহাম্মদী এস্কে ভাণ্ডার' গ্রন্থ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'ঢাকা, চুরিহাট্টা হামিদিয়া প্রেসে' মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক গজলে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ আছে। কবির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় এইরূপ—

'সোন থোড়া অধিনের কিছু হাল।
ত্রিপুরা জিলার বিচে নন্দলাল॥
নন্দলালে বসত বাটি গুণধাম॥
মহাম্মদ ফজলল হক হয় নাম॥
('মহাম্মদী এস্কে ভাণ্ডার', পৃঃ১)

৬৫। ফতন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পদটিই ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। 'ফতন' ভণিতাযুক্ত অপর একটি পদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬৬। ফতেখান—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি গান ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যা 'সম্মিলনে' প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তাঁহার পীর 'সাহা ছুলতানের' নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 'এব্রাহিম খান'-নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

'কহে ফতেখানে সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত এব্রাহিম খান।
ভব কল্পতরু জানিহ আহ্মার
পির মির সাহা ছুলতান॥'

৬৭। বক্সা আলী—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'বাঁশখালি' থানার অন্তর্গত 'ডিঙ্গেবোল'-নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'মোহাম্মদ হারি পণ্ডিত'। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। হারি পণ্ডিত-রচিত 'জৈগুণের বারমাস', 'পূর্ণিমা' পত্রিকার ১০ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বক্সা আলী ১১৭৪ মঘী সন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার রচিত একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৮। বদিয়ুজ্জমা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

৬৯। বদিয়ুদ্দিন—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'খোন্দকার ও কাজী' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'ফতেমার ছুরৎনামা' ও 'চিত্তইমান'-নামক গ্রন্থদ্বয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার পুত্রের নাম 'আমান সাহ্ কাজী'। ইনিও একজন বিখ্যাত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। 'সাহ বদিউদ্দিন'-রচিত একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭০। বহরাম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত চারিটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি পদ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন।

৭১। বুরহানী [ওরফে—নজির হোসেন]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'সুনাম-গঞ্জ' মহকুমার 'পাথারিয়া' পরগণার 'বড়থল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৭১টি গান-সম্বলিত 'এস্কে গোলজার' বা বুরহানী রাগিণী'-গ্রন্থ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। কবির মুর্শিদের নাম ছিল 'বুরহানউদ্দিন'। কবি সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

'নজির হোসেন নাম জানিবায় আমার।
বুরহানী নামেতে গান করিনু প্রচার॥
বুরহানউদ্দিন মেরা মুরসিদের নাম।
তিনি হইতে পাইনু যাহা হেকমত কালাম॥' ('এস্কে গোলজার', পৃঃ ২)

৭২। ভেলা শা—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'বালাগঞ্জ' থানার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত 'খবর নিশান'-নামক এক গান ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের সংবাদ জানা গিয়াছে। ('আল্ ইসলাহ', ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৭৩। মছন তাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 'সম্মিলন', ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৭৪। মতাহির—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'বদরপুর'-নিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২১টি গান-সম্বলিত 'হৃদয়বীণা', ১ম খণ্ড শ্রীহট্ট জেলার ইসলামিয়া প্রেস হইতে ১৯৩৯ ইং প্রকাশিত হয়।

৭৪ (ক)। মনকর—পরিচয় অজ্ঞাত। বাঙলা একাডেমী পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বাং)-য় মুদ্রিত মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী রচিত "লোক সাহিত্যে বিরহ সঙ্গীত"-শীর্ষক প্রবন্ধে এই সঙ্গীতটি মুদ্রিত হইয়াছে।

৭৫। মনোহর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। 'মনোহর' নাম হিন্দু কবির হওয়াও সম্ভব বিবেচনা করিয়া সান্যাল মহাশয় এই পদের পাদটীকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—"মনোহর নাম হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমান কবির প্রাধান্য ও তৎসমাজে এই নামের ভূরি প্রচলন দেখিয়া আমরা এই পদকর্ত্তা মনোহরকে মুসলমান কবিরূপেই গ্রহণ করিলাম।"

৭৬। মন্থঅর (বা মনৌঅর)—পরিচয় অজ্ঞাত। 'মন্থঅর'-ভণিতাযুক্ত তিনটি পদ 'ভারতবর্ষের' দুইটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৭; ১৩২৫ পৌষ, পৃঃ ৭৮)। 'মনৌঅর'-ভণিতাযুক্ত চারটি পদ 'ভারতবর্ষের' উপরি উক্ত দুই সংখ্যায় এবং 'সম্মিলন' ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'মনৌঅর'-ভণিতাযুক্ত একটি পদে কবি তাঁহার গুরু 'আএনদ্দিনের' উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'সাহা আএনদ্দিন ছোঁ পহু প্রবিন
দেখি আনন্দ পরাণ।'

'মনৌঅরের' অনুরূপ 'আছদ্দিনের' গুরুও 'আএনদ্দিন'। উভয় কবি এক গুরুর শিষ্য হইলে সমকালবর্ত্তী অনুমান করা যাইতে পারে। উচ্চারণ-বিকৃতিতে 'মনৌঅর' 'মন্থঅর' হওয়া বিচিত্র নহে মনে করিয়া 'মন্থঅর' ও 'মনৌঅরকে' অভিন্ন কবিরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। 'মনৌঅর' ও 'মন্থঅর' যে দুই পৃথক্ কবি হইতে পারেন না, এমন কথাও বলা শক্ত। সেইজন্য দুই কবির পার্থক্য-জ্ঞাপক বলবত্তর প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ইহাদিগকে এক কবি বলিয়াই গ্রহণ করা গেল।

৭৭। মর্ত্তুজা গাজী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত দুইটি পদের মধ্যে একটি ভারতবর্ষ, ১৩২৫, পৌষ সংখ্যায় (পৃঃ ৭৭) এবং উক্তপদসহ অপরটি 'মুসলিম কবির পদসাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ গাজী ও সৈয়দ ভণিতাযুক্ত পদ একই কবির রচনা বলিয়া অনুমান করেন।

৭৮। মিয়াধন—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'মৌলবীবাজার' মহকুমার অন্তর্গত 'লংলা' পরগণার 'জাবেদা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১৯টি গান-সম্বলিত 'নূতন প্রেমভাণ্ডার' গ্রন্থ ১৯৩২ ইং শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। কবির নিম্নোক্ত উক্তি হইতে তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না বলিয়াই মনে হয়।

'আমিত নাদান বন্দা কমিনা।
লেখাপড়া কিছু আমি জানি না॥

('নূতন প্রেমভাণ্ডার', পৃঃ ২)

৭৯। মির ফএজুল্লা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পাঁচটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে এবং এতদ্ব্যতীত দুইটি পদ 'ভারতবর্ষ' ও 'সম্মিলন' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৮০। মীর্জ্জা কাঙ্গালী—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পদটিই মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটি পদ 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৮১। মীর্জ্জা ফয়জুল্লা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একমাত্র পদ ঐ ৩ পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ মীর ও মীর্জ্জা ভণিতা-যুক্ত পদ একই কবির রচনা বলিয়া অনুমান করেন। তাহাদের মতে গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপীর বিজয় ও জয়নবের চৌতিশা প্রভৃতি রচয়িতা সেখ ফয়জুল্লা এবং মীর ও মীর্জ্জা ফয়জুল্লা অভিন্ন ব্যক্তি। যে স্থলে শেখ, মীর, মীর্জ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন কুলোপাধি রূপে স্বীকৃত, সে স্থলে এই তিন কুলোপাধি-যুক্ত কবিতা বা গ্রন্থ একই কবির রচনা মনে না করাই যুক্তিসঙ্গত।

৮২। মুছা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৮৩। মোছন আলি—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৪। মোহাম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটিমাত্র পদ 'সম্মিলন' ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৫। মহম্মদ আলি—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৫ (ক)। মোহম্মদ চুহর—চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালিতে ইহার জন্ম। পিতা ওয়াইজুদ্দিন। কবি তাঁহার পিতার পূর্ব্ববর্তী আরও চারি পুরুষের নাম তাহার রচিত "আজবশাহ সমনরোখ" কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাব্য-ব্যতীত কবি-রচিত "মনোহর মধুমালতী", "কামিলশাহ-দিলারাম" ও "স্বজন চিত্রবতী" নামক কাব্যের সংবাদ জানা গিয়াছে। কবি চুহর উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকার চতুর্থবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র ১৩৬৭ বাং)-য় আহমদ শরীফ সাহেব রচিত "কবি মুহম্মদ চুহর"-শীর্ষক প্রবন্ধে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন একটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

৮৬। মোহাম্মদ পরাণ—ইহার রচিত একটি মাত্র পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। ইনি এবং রাগনামা-রচয়িতা মোহাম্মদ পরাণ সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি—

"মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া
হয় কি না হয় চাহ শাস্ত্র বিচারিয়া।'
(পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৪৫০)

৮৭। মোহাম্মদ হানিফ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮৮। মোহাম্মদ হাসিম—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত 'শ্রীমাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম 'আলি মিঞা'। ইনিও কবি ছিলেন। 'কবি মহম্মদ হাসিম'-রচিত চারিটি পদ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। এতদব্যতীত আরও তিনটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

৮৯। রউফ [আবদুল রউফ চৌধুরী]—শ্রীহট্ট জেলার 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত 'ভাটীপাড়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত, 'বিচ্ছেদ-সঙ্গীত' গ্রন্থে মোট ৩৭টি গান আছে। কবি তাঁহার পত্নী চৌধুরাণী ফকরুন্নেছা বানুর মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি সঙ্গীত তাঁহার মৃতা পত্নীর উদ্দেশে রচিত, কয়েকটি সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ আছে।

৯০। রজবউদ্দিন—ইনি কাছাড় জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 'মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়াণীর গীত'-গ্রন্থে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীত আছে।

৯১। রহিমুদ্দিন [ফকির]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'বালাগঞ্জ' থানার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত দুইটি পদ 'মোহাম্মদ আশ-রাফ্ হোসেন'-সঙ্কলিত 'রাগ মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯২। রেয়াহক—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

৯৩। লালন—ইনি নদীয়া জেলার 'কুষ্টিয়া' মহকুমার অন্তর্গত 'ভাঁড়োরা' বা 'ভাঁড়ারা' গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী 'সেঁউরিয়া' গ্রামে দেহত্যাগ করেন। কাহারও কাহারও মতে লালন হিন্দুর সন্তান ছিলেন, পরে 'দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের' নিকট বাউল সহজিয়া অথবা সুফী মতে দীক্ষিত হন। ইহার রচিত বহু সঙ্গীতে তাঁহার গুরু দরবেশের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। 'প্রবাসী' ও 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় এবং 'হারামণি' গ্রন্থে লালনের বহু গান প্রকাশিত হইয়াছে।

৯৪। লালবেগ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯৫। লালমামুদ—ইনি ময়মনসিংহ জেলার 'নেত্রকোণা' মহকুমার 'নারায়ণ ডহরের' সন্নিকটবর্ত্তী 'বাওই ডহর' গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কালু। 'লালমামুদ' গ্রামের পাঠশালায় যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে ইনি গাজীর কীর্ত্তন করিতেন। পরে কবির দলে যোগ দেন। এই সময়ে হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও চৈতন্যলীলা গ্রন্থ পাঠ করার ফলে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তিনি আপন বাটীর নিকটস্থ নদীতীরে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে তুলসী স্থাপন করিয়া রীতিমত সেবাপূজা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে নিরামিষাশী হইয়া স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে আরম্ভ করেন। 'লাল-মামুদ'-স্থাপিত তুলসীমঞ্চের সম্মুখে খোলকরতালসংযোগে প্রত্যহ দুইবেলা কীর্ত্তন হইত।

৯৬। সাহা আকবর—এই ভণিতাযুক্ত একটি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পদটিই রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে এবং ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রজবুলি-ভাষায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে রচিত এই পদটি সম্রাট্ আকবরের রচনা। সম্রাট্ নাকি সভক্ত শ্রীচৈতন্যের হরিসংকীর্ত্তন-চিত্র দেখিয়া বিহ্বল হইয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে আলোচ্য কবিকে জনৈক ফকির বলিয়া অনুমান করেন।

৯৭। শীতালং শাহ—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'করিমগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত 'ভাঙ্গার' নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। প্রৌঢ়বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া যান। ইহার রচিত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বহু সঙ্গীত শ্রীহট্ট অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ইহার রচিত প্রায় তিন শতাধিক গানের

এক পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে 'শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্যসংসদ্ গ্রন্থাগারে' রক্ষিত আছে।

৯৮। শেখ কবির—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ 'ভারতবর্ষের' ১৩২৫ বাং পৌষ-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদে 'সুলতান নছির শাহের' উল্লেখ আছে। এই কবি 'নছির শাহের' সমকালবর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়। তুল—'ছুলতান নছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে'।

৯৯। শেখ ভিখন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণী-মোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই পদটিই ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০০। শেখলাল—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পদটিই ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

১০১। সদাই শাহ [ফকির]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত 'বালাগঞ্জ' থানার লোক ছিলেন। ইহার একটি গান 'মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন'-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত', প্রথমভাগ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০২। সমসের—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০৩। সর্ফতোল্লা—ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'বাঁশখালী' থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতা অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি 'আলিরাজা' বা 'কানুফকির'। আলিরাজার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান কবি সর্ফতোল্লা। ইনিও পিতার ন্যায় বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত পদে পিতা আলিরাজার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

যথা— 'কাতর কিঙ্করে ডাকে বারে বারে
সাহা আলিরাজা পায়।'

ইহার রচিত একটি পদ 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১০৪। সালবেগ—ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। উড়িয়া ভাষায় রচিত 'দার্ঢ্যভক্তি'-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঠানরাজের এক মুসলমান সেনাধ্যক্ষ বলপূর্ব্বক জনৈকা হিন্দু বিধবাকে গ্রহণ করেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের ঔরসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়। সালবেগ পরবর্ত্তী জীবনে একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন। ইহার রচিত তিনটি পদ (১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২-সংখ্যক পদ) 'পদকল্পতরুতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে একটি পদ (৪৪৩-সংখ্যক পদ) 'পদরসসার' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "Typical Selections from the Oriya Literature, vol. II." গ্রন্থেও সালবেগের কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-রচিত 'ভক্তের জয়' গ্রন্থে 'দার্ঢ্যভক্তি' হইতে সালবেগের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। সালবেগের পদ উড়িষ্যার মন্দিরে এখনও নাকি গীত হয়। এই উড়িয়া কবির পদ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ আদরের বস্তু বলিয়াই 'বৈষ্ণবদাস'-সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'তে ইহা স্থান পাইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সালবেগ তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর ব্রজমণ্ডলে চলিয়া যান এবং তথায় স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। সালবেগের একটি কবিতায় (পদকল্পতরু, ২৯৭২-সংখ্যক পদ) ব্রজভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই পদ দৃষ্টে কবি শেষ বয়সে বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়।

১০৫। সিরতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 'সম্মিলন', ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১০৬। সেরচান্দ—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০৭। সৈয়দ আইনদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত রাধাকৃষ্ণলীলার ১৫টি পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৮টি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পদগুলি 'ভারতবর্ষ' ও 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইনি সম্ভবতঃ 'সাহা আকবর'-নামক জনৈক ফকিরের শিষ্য ছিলেন। যথা—

'কহে আএনদ্দিনে কেলি অনুক্ষণ
সাহা আকবর পদে করিয়া চুম্বন।'

সাহ, সাহা বা সা'র মূল অর্থ রাজা। ইহা ফার্সী শব্দ। মুসলমান সাধু ও ফকিরদিগের নামের সঙ্গে এই উপাধি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা:—শাহনূর, ভেলা শা ইত্যাদি। আইনদ্দিনের দুই শিষ্য 'আছদ্দিন' ও 'মনৌঅর'-রচিত পদ বর্ত্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌরলীলার পদরচয়িতা জনৈক 'সাহা আকবরের' নাম আমরা অবগত আছি। সেই 'সাহা আকবর' ও আইনদ্দিনের গুরু 'সাহা আকবর' একই ব্যক্তি কিনা বলা দুরূহ। নামসাদৃশ্য বশতঃ এই উভয় ব্যক্তি এক হওয়া অসম্ভব নহে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

১০৮। সৈয়দ আলী [ফকির]—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত মাত্র একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০৯। সৈয়দ জহরুল হুছন—শ্রীহট্ট জেলার তরফ পরগণার মধুপুর গ্রামে ১২৮৩ সালে ইহার জন্ম, ইনি দাউদপুরের বিখ্যাত শাহ দাউদের বংশধর। ইহার পিতার নাম—শাহ ইজাবত আলী। ইনি প্রথম বাসৈ পরগণার এক মাদ্রাসায়, পরে মোমেনশাহী জেলার মঙ্গলবাড়ী মাদ্রাসায় এবং শেষে ঢাকা গবর্ণমেন্ট মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত "নূরনাজাত" গ্রন্থ সিলেটী নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জাওয়াহির'—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈয়দ মোরতাজা আলী বি, এ সাহেব ১৩৫৩ বাং প্রকাশ করেন। গত ১৩৪৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। জাওয়াহিরে প্রকাশিত টি গানের মধ্যে টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

১১০। সৈয়দ নাসিরদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত চারটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবি একটি পদে 'সাহা আবদুল্লা' নামক জনৈক ব্যক্তিকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। এই আবদুল্লাকে কবির পীর বা দীক্ষাগুরু বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে—

'কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি,
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি।'

১১১। সৈয়দ নিয়ামত—ইনি দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার 'কমলগঞ্জ' থানার অন্তর্গত 'ভানুগাছ' পরগণার 'রঘুনাথপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

ইহার পিতার নাম কেরামত আলী। ইহার রচিত একটি পদ মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ বাউল', প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

১১২। সৈয়দ মর্ত্তুজা—জনশ্রুতি এই যে, সৈয়দ মর্ত্তুজার পিতা 'হাসান কাদেরী' সাহেব বেরেলী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার 'জঙ্গীপুরের' নিকটবর্ত্তী 'বালিয়াঘাটা'-নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইহারই রচিত একটি পদ 'পদকল্পতরুতে' (২৯৫৭-সংখ্যক পদ) উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সৈয়দ মর্ত্তুজা'-ভণিতাযুক্ত এযাবৎ ২৮টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ পদসমূহের মধ্যে 'মাসিক মোহাম্মদীতে' (১৩৪০, আষাঢ়) একটি, 'ভারতবর্ষে' (১৩২৫, পৌষ) চারটি এবং ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', প্রথম খণ্ডে ২৩টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে 'মর্ত্তুজা' ভণিতাযুক্ত মাত্র একটি পদ আছে। ঐ পদ ব্যতীত আরও ২২টি পদসহ 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' প্রথমখণ্ড মুদ্রিত হয়। 'পদকল্পতরুর' পদটি ব্যতীত অপর সকল পদ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত রাগ ও তালবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থহইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত পদের সৈয়দ মর্ত্তুজা এবং চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদসমূহের সৈয়দ মর্ত্তুজা এক ব্যক্তি কিনা, এই সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। 'পদকল্পতরু'-সঙ্কলয়িতা মুসলমান কবিদের যে-সকল পদ তাঁহার সংগ্রহে স্থান দিয়াছেন তাহা বহু-প্রচলিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। সৈয়দ মর্ত্তুজার যে পদটি 'পদকল্পতরু'তে আছে তাহা চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। 'পদকল্পতরু'র কবিতাটি চট্টগ্রামের কবির রচনা হইলে ইহা চট্টগ্রামে না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('সুধা', ১ম বর্ষ, মাঘ-সংখ্যা) মুর্শিদাবাদবাসী 'সৈয়দ মর্ত্তুজা'-নামধারী জনৈক মুসলমান ফকীরের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পিতার নাম 'হাসান কাদেরী'। এই ফকীরই সম্ভবতঃ 'পদকল্পতরু'-ধৃত পদের রচয়িতা। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'মর্ত্তুজা'-ভণিতাযুক্ত পদসমূহের রচয়িতারও কোন সন্ধান চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। 'মর্ত্তুজা' নামধারী একাধিক কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, মুর্শিদাবাদবাসী যে কবির সমাধি বর্ত্তমান এবং যে সমাধিস্থলে এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসে এবং বহু স্থান হইতে মুসলমান ফকিরেরা আসিয়া থাকেন, সেই ফকিরের পদসমূহ তাঁহার

জন্মস্থান-সান্নিধ্যে লোপ পাইল কেমন করিয়া? আবদুল করিম সাহেব-সংগৃহীত কবিতার ২১৪টি মুর্শিদাবাদ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইলে একাধিক কবির কল্পনার অবকাশই থাকিত না। এই-সকল কারণে আবদুল করিম সাহেব সমনামধারী দুই কবির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। যথা—

"দুইদিকে দুইজন সৈয়দ মর্ত্তুজার কীর্ত্তিচিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুর্শিদাবাদবাসী ছিলেন। আর আমরা চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার বহুল পদাবলী আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের সংগ্রহে পদাবলীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই উভয় কবিকে অভিন্ন বলিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়। যে কবির কীর্ত্তি চট্টগ্রামে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তিনি মুর্শিদাবাদবাসী, ইহা বিশ্বাস করিতে সহজেই দ্বিধা জন্মে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কোন পদই এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে।"—('সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী', 'সাহিত্য' ১৩১০, পৌষ, পৃঃ ৫৫২।)

১১৩। সৈয়দ মর্ত্তুজা—পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রায় সকল পদ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত রাগ ও তাল-বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবির পদসমূহ হইতে তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এক-স্থলে কবি নিজেকে 'জনমের ফকির' ও অন্যত্র 'গাজী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তুলনীয়—'কহেন মর্ত্তুজা আলী জনমের ফকির' (দ্র ১, পৃঃ ১২) 'সৈয়দ মর্ত্তুজা গাজী' (দ্র ১, পৃঃ ১৪)।

১১৪। সৈয়দ শাহনূর—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার 'সৈয়দপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত 'নূর নাছিহত'-নামক মারিফতি গানের এক সংগ্রহগ্রন্থ বর্ত্তমানে 'শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্যসংসদ্ গ্রন্থাগারে' রক্ষিত আছে।

১১৫। সৈয়দ সুলতান—ইনি শ্রীহট্ট জেলার 'হবিগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত 'লস্করপুরের' প্রসিদ্ধ সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত 'নবীবংশ', 'শবে মেয়েরাজ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' নামক তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 'শবে মেয়েরাজ' কবির শেষ রচনা, ইহা—'গ্রহশত রস যোগে অব্দ'—অতীত

হইলে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরী=১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকত্রয় ব্যতীত কবি-রচিত অনেকগুলি পরমার্থ-সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। ব্রজসুন্দর সান্যাল-সঙ্কলিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে সৈয়দ সুলতান-রচিত তিনটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডাঃ এনামুল হক-লিখিত 'কবি সৈয়দ সোলতান' প্রবন্ধে (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪১ ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৮) ৬টি গান প্রকাশিত হইয়াছে। সৈয়দ সুলতানকে ডাঃ হক চট্টগ্রামবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত'আল্ ইস্লাহ', এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'-পত্রিকার দুইটি প্রবন্ধে ('আল্ ইস্লাহ', ৮ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১ ; 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৫১ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৯৬) কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। শেষোক্ত মতই অধিকতর সমীচীন মনে করিয়া কবিকে শ্রীহট্ট-বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

১১৬। সোন্দর ফকীর—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি মাত্র পদ মুসলিম কবির পদ-সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

১১৭। হবিব (ফকির)—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পদটিই ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

১১৮। হাছন রজা [চৌধুরী]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 'রামপাশা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম 'আলি রজা চৌধুরী'। ইনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ 'সুনামগঞ্জ' মহকুমার অন্তর্গত 'লক্ষ্মণশ্রী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'খানবাহাদুর দেওয়ান গণিউর রজা চৌধুরী' ও দ্বিতীয় পুত্র 'খানবাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রজা চৌধুরী'। হাছন রজার পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। কবির জীবিতাবস্থায় তাঁহার গানের এক সংগ্রহ 'হাছন উদাস' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ করেন। এই সংস্করণে মোট ২০৬টি গান মুদ্রিত হইয়াছে। কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দার্শনিক-সঙ্ঘের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে এই কবির উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটা বড় তত্ত্ব পাই, সেটা এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন—

'মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।'

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

'রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে॥'

১১৯। হাসমত্—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিতমাত্র একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২০। হাসিম—পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত দুইটি পদ ঐ ৪ পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১২১। হুছন [মুন্সী হুছন আলী]—ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'জৈন্তাপুরের' অন্তর্গত 'বিড়াখাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১৩টি গান-সম্বলিত "প্রেমসতী, ২য় খণ্ড' গ্রন্থ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

দুরূহ শব্দ-সূচী

[প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে লিখিত সংখ্যা, ঐ শব্দ 'পদ-সংগ্রহ' অংশের যে পদে আছে, সেই পদের ক্রমিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। তারকা-চিহ্নিত সংখ্যাদ্বারা উক্তসংখ্যক পদের 'কবি-পরিচয়'-অংশে এই শব্দ আছে বুঝিতে হইবে। আ = আরবী, ফা = ফার্সী, উ = উর্দ্দু।]

অ

অথান্তর ৬২—অব্যবস্থা, অসুবিধা।

অনাতি ১৬—অনাথী, দুঃখী, ভাগ্যহীনা।

অনাদানে ১০৬—বিনাদানে।

আ

আইতা ১৬—আসিবে, আসিবার সম্ভাবনা-যুক্ত, প্রতীক্ষা।

আউলা ১১১, ৯০—এলোমেলো।

আউলাই ২৬, ৬৫—আলুলায়িত করিয়া।

আউলাঝাউলা ১০১—এলোমেলো।

আওবি ৫২—আস।

আওর ২৭—আরও।

আংখির ৫৩—আঁখির, চক্ষের।

আকাষ্টা কাষ্ঠের ৩৭—সারহীন কাঠের।

আকুতে ৯৪—আকুতিতে, আগ্রহে, আকাঙ্ক্ষায়।

আগি ৪৫—অগ্নি।

আচোট ভূঁয়ে ৩৬—অচষা ভূমিতে, অকর্ষিত ভূমিতে।

আছর (আ) ৩২—ফলপ্রসূ।

আজু ৩—আজ, অদ্য।

আজু কালুকা ২২—আজকাল।

আড় ২৪, ১১৩—বক্র, বাঁকা।

আড়ে ৮৫—আড়ালে।

আতস (ফা) ৩৮, ৬২—অগ্নি।

আনলেতে ৮০—অনলেতে, অগ্নিতে।

আন্ধার ৬৯—অন্ধকার।

আপে ২৩, ৪৯—আপনি, নিজে।

আপে আপ দেখিবার ৪—নিজে নিজেকে দেখিবার।

আবাল ৮—ছোট, শিশু।

আবের (ফা) ৩৮, ৬২—পানির, জলের।

আরসি পড়সি ১১—পাড়াপ্রতিবেশী।

আরের ৭৫—অন্যের।

আলীয়া ২৪—অগ্নিস্থলী, আগুন রাখিবার পাত্র।

আলেক্ রব্বানি (আ) ৪৩—তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনিয়ন্তা।

আল্লা (আ) ৯৫—পরমেশ্বর।

আসমান (ফা) ১১৮*—আকাশ।

আসিক (আ) নামা (ফা) ৩২*—প্রেমিকের কাহিনী।

আহাদ (আ)—৬৮ এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

আন্ধার ৩৫, ৬৬*—আমার।

ই

ইন্তিজার (আ) ৯৭—অপেক্ষা।

ইন্তিজারী (আ) ১৮—অপেক্ষা।

উ

উল্লাস ৩—মুখরিত (?)।

উজাগর ৪—জাগরণ, বিনিদ্র থাকা।

উঝল ৭৬—উজ্জ্বল।

উঠামে ২৭—উঠাইয়া।

উদনে ১২—উদয়ে, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

উরে ৯৪—বক্ষস্থলে।

উরেতে ৫১—বক্ষস্থলে, এ স্থলে ক্রোড়ে।

উল্লোল ৩—উল্লাস।

ঋ

ঋতুসঙ্গী লাগি ১০৩—ঋতুস্নাতা বলিয়া।

এ

এরসর ৩১—একেশ্বর, একা।

এথলা ৯৪—একাকী।

এতিম (আ) ৫৪—পিতৃমাতৃহীন।

এথ ১০, ১১৯—এত।

এস্তার ৫৮—(পোর্তু) অজস্র।

এবেহ ন ৬৬—এখনও না।

এস্কে (আ) গোলজার (ফা) ৭১*—প্রেমের বাগিচা।

এস্কে (আ) দেওয়ানা (ফা) ২*—পাগলের প্রেম।

এস্কে (আ) ভাণ্ডার ৬৪*— প্রেমের আধার।

এহা ৬০—ইহা।

ও

ওজিফা (আ) ১০৮—আরাধনা, উপাসনা।

ওহার ৪—উহার।

ক

কবর (আ) ৪৮—সমাধি।

কমিনা (ফা) ৭৮*—হীন, তুচ্ছ।

কল্‌মা (আ) ৭৪—শব্দ, ঐশ্বরিক বাণী।

কাঁচনি ৫২—কাছা, কচ্ছ।

কাতে—কাহাতে, কাহার সঙ্গে।

কাঙ্কা ৩৭—কাঁচা।

কানরি ৫২—কানু।

কাফ্ আর নু হরফে (আ) ৯১—কাফ্ ও নু যথাক্রমে আরবীয় বর্ণমালার ২২ ও ২৫ সংখ্যক অক্ষর, এই দুই অক্ষর সংযোগে 'কুন' শব্দ, অর্থ 'হও'।

কামদ গায় ১১৯—কামদ রাগিণীতে গান করে।

কালাম (আ) ২০—কথা, বাণী।

কিসকে ৩১—কেন।

কীর ৪০—শুক জাতীয় পাখী।

কুদরুত (আ) ৬৮—গৌরব, ক্ষমতা।

কুরা ৩৭—লগি, নৌকাবাহন বংশদণ্ড।

কুলিস ৬৬—বজ্র।

কেওরর ৯৭—কাহারও।

কৌর ৪—ক্রুর (?), নির্দয়

কেপস্থে ৫৬—নিক্ষেপ করে।

খ

খরিএ ৬৬—ক্ষয় হয়।
খাকার ১০৫—নিন্দা, অপযশ।
খাকের (ফা) ৩৮, ৬২—মাটির।
খাজা ৫৮—ময়দার খাদ্যবিশেষ।
খানা পানি (ফা) ১০৮—খাদ্য ও পানীয়।
খাপি ৩৬—ক্ষেপা, পাগল।
খামসা (আ) ১২১—পাঁচ।
খুরলি ৫২—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।
খুসবয় (ফা) ১১৮*—সুগন্ধ।
খেদ ৪৬—দুঃখ।
খেদমত (আ) ২*—সেবা।
খেদায় ১১১—মনের দুঃখে।
খেবা ৪৭, ৬০—খেওয়া, খেয়া নৌকা।
খোটা, খুটা ২১, ২৫, ২৬, ১০৫—নিন্দা, অপযশ।
খোদা (ফা) ৯৫—পরমেশ্বর।

গ

গণ্ডকুলে ৩২—গণ্ডগোলে, গোলমালে।
গানরি ৫২—গান।
গাহনি ৩৮—গাঁথুনি।
গুণারী ১০১—যাহারা নৌকার গুণ টানে।
গুণাহ (ফা) ৫১—পাপ।
গুমরি ৩৬—চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করা।
গুমান (ফা) ৯৮, ৭৩—অহঙ্কার, গর্ব্ব, গৌরব।
গুরুবিত ১০৩—গৌরবিত, গৌরবযুক্ত।
গুলাম ২*—(আ) বালক, (ফা) দাস।
গোড়া গা ১১৩—গোরা অর্থাৎ গৌর-বর্ণ, এস্থলে অতি সুন্দর ; মৃদু।
গোঞাইলুম, গোয়াইলাম ২৫, ৫৩—অতিবাহিত করিলাম।
গোলশনে (ফা) বাহার (আ) ৬১—বসন্তের বাগিচা।

ঘ

ঘাটিয়াল ৬—ঘাট রক্ষাকারী।
ঘুমঠ ২৭—অবগুণ্ঠন, ঘোমটা।

চ

চউকের ২০—চক্ষের।
চলু ৯৬—চলে।
চুনি চুনি ১৫—বাছিয়া বাছিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া।
চেরা ৯৭—চেহারা, আকৃতি।
চৌকি ৮৩—প্রহরী।

ছ

ছাপাই ৫৪, ৯০—লুকাইয়া, গোপন করিয়া।
ছাবাল ২, ১৮—শিশু, সন্তান।
ছালি ৪১—ছাই, ভস্ম।
ছিপতি (আ) ৯১—বর্ণনা।
ছির ৯৭—শির।
ছুয়া ১০৯—দংশন, ছোবল।
ছুরতের (আ) ৪১—রূপের।
ছেল ২, ২৯, ৯৭—শেল।
ছোট না ১৫—ছোট হেন, ছোট্ট, বালিকা-সদৃশ।

ফুটি চাউলা ১০১—অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত।

ব

বইয়া ২২—প্রবাহিত হইয়া।
বড়াই ১০৬—গর্ব্ব।
বন্দা (ফা) ৭৮—বান্দা, গোলাম, দাস।
বন্দের ৯, ৩৮, বন্ধের ১০২—বন্ধুর।
বমাল ৫৮ (ফা)—চোরাই মাল।
বয়ান (আ) ১৬—বর্ণনা।
বস ৬, ৭০—বয়স, শক্তি।
বাটোয়ারী ৭৭, ১০৬—বাটপাড়ি।
বাত ৬২—বায়ু।
বাথান ৭৫—গোশালা।
বাদাম দিয়া ১৯—পাল টানাইয়া।
বাদী ৯—শত্রু।
বানাই ৮৩—তৈয়ার করিয়া।
বানালে ৯৯—বানাইলে।
বাবর ৪৮—ভীতিসঙ্কুল।
বায়ে ১০৪—বাজায়, বাদ্যধ্বনি করে।
বার ২১—বাহির।
বাহুলে ১৯—বাউলে, উদাসী, ক্ষেপা।
বিচে ৬৪—মধ্যে।
বিদগধি ৪—বিদগ্ধ জন।
বিদিত ৭৬—জানা, লোকে খ্যাত।
বিমর্ষিমু ৬২—বিচার করিব।
বুধি ১০০—বুদ্ধি।
বুলিয়া ৯৪—বলিয়া।
বে (ফা) করার (আ)—৯৭—অশান্ত, অস্থির।
বোট ২—পুত্র।
বেদনি ৬—বেদনাদাত্রী।
বেরি বেরি ২৭—বার বার।
বেসমার (ফা) ৯৭—অনেক, অসংখ্য।
বেসাত ১১—পণ্য।
বেহানে ৮৫—প্রভাতে, প্রত্যূষে।
বেহার ২১—বিহার।
বোলাই ৩১—বলিয়া।

ভ

ভজমান ৪৬—যে ভজনা করে।
ভাড়িলে ১১৪—ঠকাইলে।
ভানরি ৫২—উপমিত হয়, তুলিত হয়।
ভারা ৬৬—ভারস্বরূপ।
ভাষান ৭—লঘু, হাল্কা, অগভীর।
ভুখিলা ৭২—অভুক্ত, ক্ষুধার্ত্ত।
ভুসির ১১৪—গম, দাইল প্রভৃতি শস্যের খোসার।
ভেদ ৯১—অর্থ।
ভেল ৩৫—হইল।
ভেল আড়া ৭৬—অন্তর হইল, সরিয়া গেল।

ম

মই ৭৪—বাঁশের সিঁড়ি।
মইলে ৯১—মরিলে।
মওলার (আ) ৬৯—ঈশ্বরের।
মনাই ১০১—মন।
মস্তুরা ২৩, ৬৯—মন, আত্মা।
মনোহরা ৫৮—মিষ্টিবিশেষ।
মাইয়া ৪৭—মেয়ে।
মাইল ২—মারিল।
মাঝা ১৫—কোমর, দেহের মধ্যস্থল।

স

সমছুল (আ) ইছলাম (আ) আসিকে বারাম (আ) ১৬—বারামের প্রিয় ইসলামের সূর্য্য।

সয়ালে ১১৪—সকলে।

সাইদ (আঁ) ৮—সাক্ষী।

সাখি ৯৯—সাক্ষী।

সাঙলি ৫২—শ্যামলী, কাল গরুর নাম।

সাঙ্গ ২৪—সমাপ্তি, শেষ।

সাঁচা ৮০—সত্য।

সাঁঝুয়া ৮০, ১১৯—সন্ধ্যা।

সাধা ৩৫—সাধ, এস্থলে সিদ্ধহস্ত।

সানে ৭৫—স্বরে।

সামাল ৫৮—সাবধান।

সারঙ্গ ১০৩—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

সিঁদ ১০০—চুরি করিবার অভিপ্রায়ে গৃহের প্রাচীরাদিতে গর্ত্ত করা।

সুতিলে ২—ঘুমাইলে, শয়ন করিলে।

সুবইনের ৩৮—সুবর্ণের।

সুরঙ্গ ৪—সুন্দর।

হ

হওম ১০৬—হই।

হকিকতে (আ) মারিফত (আ) ১৯—সত্যজ্ঞান, যথার্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

হকিকতে (আ) সিতারা (ফা) ১১—ভাগ্যের গতি।

হট ৬২—শীঘ্র, হঠাৎ।

হরিষ ৩—হর্ষ।

হায়স (ফা) ১২১—ইন্দ্রিয়, রিপু।

হাল (আ) ৬৪—অবস্থা।

হালিয়া গোঁআর ১০৫—হালিয়া = চাষা, গোঁয়ার = মূর্খ, দুঃসাহসিক কার্য্যে দ্বিধাহীন।

হাসর (আ) ৪৮, ৮২—বিচারের দিন।

হেকমত (আ) ৭১—জ্ঞান।

হোস্তে ৩—হইতে।

হোয়ত ৯৬—হইতেছে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সূচী

যে-সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমান কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

১। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'—সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ.-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ [৪৪৩ সংখ্যক পদ] আছে।

২। 'আবেগ, প্রথম খণ্ড'—ছৈয়দ আবদুল বারী-প্রণীত, ১৩৩৯ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩৯টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩৪নং গানটি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক।

৩। 'আবেগ, দ্বিতীয় খণ্ড'—ছৈয়দ আবদুল বারী-প্রণীত, ১৩৪৫ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৪৫টি গান আছে। তন্মধ্যে ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৫ ,৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৪নং—মোট ১০টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪। 'আসিক নামা' [প্রেমিকের কাহিনী]—মৌলবী আবদুল মজিদ-প্রণীত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৮টি গান আছে। তন্মধ্যে মাত্র একটি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪ (ক)। কবি মুহম্মদ চুহর—আহমদ শরীফ-লিখিত, বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭, পৃঃ ৪৩।

৫। 'এস্কে গোলজার বা বুরহানী রাগিণী'—নজির হুসেন-রচিত। এই গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে ১৩৪৫ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭১টি গান আছে। তন্মধ্যে ১২, ১৫, ১৭, ২১, ২৮, ৩৯, ৭০ ও ৭১ নং পদ-স মূহ রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানি আরবী ও ফার্সী গ্রন্থের অনুরূপ ডান দিক হইতে বাম দিকে গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন পংক্তিসমূহ ভারতীয় লিপিরীতি অনুযায়ী বাম দিক হইতে ডানদিকে গিয়াছে।

৬ 'এস্কে দেওয়ানা' [পাগলের প্রেম]—আকবর আলী-প্রণীত, ২য় সংস্করণ, ১৩৩৮ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৯টি গান আছে। তন্মধ্যে ১৯টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৭। 'এস্কের বাগান, প্রথম খণ্ড'—উম্মর আলী-বিরচিত, শ্রীহট্ট ইসলামিয়া

প্রেসে ১৩৩৫ বাং মুদ্রিত। ইহাতে ৬টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক গান আছে। পৃঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০ ও ২৪ দ্রষ্টব্য।

৮। 'কবি পাগলা কানাই'—ডক্টর মযহারুল ইসলাম এম. এ., পি. এচ. ডি, বাংলা বিভাগ, রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক সম্পাদিত এবং রাজসাহী হইতে প্রকাশিত ১৩৬৬ বাং। এই গ্রন্থে কবি পাগলা কানাই রচিত ২৪০টি গান আছে তন্মধ্যে ১২টি পদ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন।

৯। 'কাব্য-মালঞ্চ'—আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত, ১৯৪৫ ইং প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ১১৫ জন মুসলমান কবির কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৯ জন মুসলমান কবির বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে:—আলাওল-রচিত ৩টি, মর্ত্তুজা ৪টি, নসির মামুদ ৩টি, হবিব ১টি, আলীরাজা ২টি, ফতন ১টি, মির্জ্জা কাঙ্গালী ২টি, আক্‌বর সাহ ১টি, কবীর ১টি, কমর আলি ১টি, আয়হুদ্দিন ১টি, সালবেগ ২টি, ভিখন সেক ১টি, হাসিম ১টি, হানিফ ১টি, বদীউদ্দীন ১টি, মোহাম্মদ রাজা ১টি, আফজল আলি ১টি, শীতালং ১টি, মোট ২৮টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ এই সঙ্কলনে আছে।

১০। 'কীর্ত্তন পদাবলী'—সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত, ১৩৪৫ বাং মুদ্রিত। ইহাতে চাঁদ কাজী [পৃঃ ১৬], সালবেগ [পৃঃ ১৪৯], ও সৈয়দ মর্ত্তুজার [পৃঃ ৪১৪] এক একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১১। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'—জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত, ২য় সংস্করণ, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, ১৩৪১ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থে সাহা আক্‌বরের একটি পদ আছে [পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য]।

১২। 'গোলসানে বাহার'—মুন্সী শেখ ফএজর রহমান চৌধুরী-প্রণীত, ১৩৩৮ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের একাধিক গানে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

১৩। জাওয়াহির—সৈয়দ জহুরুল হুছেন-রচিত। তাহার পুত্র সৈয়দ মোরতাজা আলী বি. এ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৩ বাং। এই গ্রন্থে কবি-রচিত মোট ১৪৭টি গান আছে, তন্মধ্যে ৩২টি গান বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন।

১৪। 'তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই'—আবদুল ওয়াহিদ-প্রণীত। এই গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৩৪২ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৪১টি গান আছে, তন্মধ্যে ২২নং ও ৩০নং গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

১৫। 'তরিকতে হক্কানী'—রমজান আলী ওরফে ছাওয়াল সা-প্রণীত। ইহা শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ৬৯টি গান আছে, তন্মধ্যে ৪১নং ও ৫৯নং গান দুইটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারের' অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

১৬। 'নূরের ঝঙ্কার, প্রথম খণ্ড'—ইব্রাহিম তস্না-রচিত। ৩৫টি গান-সম্বলিত এই গ্রন্থ শ্রীহট্ট ইস্‌লালিয়া প্রেসে ১৩৪৬ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের মাত্র ৭টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

১৭। 'পদকল্পতরু'—বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত। সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ. সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত তিনজন মুসলমান কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা পদ আছে :—[ক] নশির মামুদ (১৩২৯ সংখ্যক পদ), [খ] সালবেগ (১৫৪২, ২৪৭২, ১৯৭২ সংখ্যক তিনটি পদ); [গ] সৈয়দ মর্ত্তুজা (২৯৫৭ সংখ্যক পদ)।

১৮। 'পাঠমালা, প্রথম খণ্ড'—মুহম্মদ মনস্থর উদ্দীন, এম. এ. সম্পাদিত। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান, পাঠমালা, প্রথম খণ্ড'-শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্ভবতঃ ১৩৫১ বাং প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন ডাঃ সুশীলকুমার দে। ইহাতে মোট ১৩টি পদ আছে। তন্মধ্যে আক্‌বরের ১টি, কবীরের ১টি, নসির মামুদের ২টি, ফতনের ১টি, মর্ত্তুজার ৪টি, সালবেগের ১টি, শেখ ভিখনের ১টি, সেখ লালের ১টি এবং হবিবের ১টি পদ আছে।

১৯। 'পিরিতের ঢেউ'—মোহম্মদ আবুল হুছন-প্রণীত। ইহাতে সর্ব্ব-সমেত ১৬টি গান আছে। তন্মধ্যে ৬টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

২০। 'প্রাচীন পুথির বিবরণ', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যা—মুন্‌সী আবদুল করিম-সঙ্কলিত, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে নাছির মহম্মদের একটি [প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৩], আইনদ্দিনের একটি [পৃঃ ৫৯], বদিউদ্দিনের একটি [পৃঃ ৬৫], আলিরাজার একটি [পৃঃ ৭৮], আপঝলের একটি [পৃঃ ১১৮], মহম্মদ হানিফের একটি [পৃঃ ১৮৭], কমর আলীর একটি [পৃঃ ১৮৮], লালবেগের একটি [পৃঃ ২৪৯], মীর্জা কাঙ্গালীর একটি [দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৬৭]—মোট ৯টি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

২১। 'প্রেম ভাণ্ডার'—মিয়াধন-প্রণীত। শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৯৩২

ইং মুদ্রিত। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১৯টি গান আছে। তন্মধ্যে ১৪, ১৮ ও ১৯নং পদ ব্যতীত অপর সকল পদই রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

২২। 'প্রেমসতী, দ্বিতীয় খণ্ড'—মুন্সী হছন আলী-প্রণীত, ২য় সংস্করণ, ১৩৪২ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৩টি গান আছে। তন্মধ্যে ৩নং এবং ৯নং গান দুইটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজাঁরে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

২৩। 'প্রেমের দেওয়ানা' [প্রেমের পাগল], প্রথম খণ্ড—আবদুল মালীক-প্রণীত, ১৩৪৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৮টি গান আছে। তন্মধ্যে ৪টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

২৪। 'ফানায়ে জান' [আত্মার নির্ব্বাণ]—আকবর আলী-প্রণীত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২২টি গান আছে। তন্মধ্যে ৪টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

২৫। বাংলার বাউল ও বাউল গান—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম.এ., ডি. ফিল. কর্তৃক সম্পাদিত; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৪ বাং। এই গ্রন্থে কয়েকজন মুসলমান বাউলের গান উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে লালন ও পাঞ্জশাহের কয়েকটি গান বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

২৬। 'বিচ্ছেদ-সঙ্গীত'—আবদুর রউফ চৌধুরী-রচিত, ১৩১৯ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক তিনটি গান আছে।

২৭। 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে আলাওলের একটি [পৃঃ ১২৪], গরীব খাঁর একটি [পৃঃ ১২], চাঁদকাজীর একটি [পৃঃ ১০৪], ও সৈয়দ মর্ত্তুজার একটি [পৃঃ ১৪৬] পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

২৮। 'বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি'—দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, বি. এ.-সম্পাদিত, ১৩৩১ বাং প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৯। 'বৈষ্ণব-পদাবলী' [চয়ন]—দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক ১৯৩০ ইং প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সৈয়দ মর্ত্তুজার একটি পদ [পৃঃ ১১৭] মুদ্রিত হইয়াছে।

৩০। 'মহাম্মদী এস্কে ভাণ্ডার' [প্রেমের আধার]—মোহম্মদ ফজলল্ হক সিকদার-প্রণীত, ১৩৪২ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৫০টি গান আছে। তন্মধ্যে ৯, ১৯ ও ২২নং গান তিনটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৩১। 'মারিফতি উদাস বাউল'—মোহাম্মদ ইরপান সা-রচিত। এই গ্রন্থ শিলচর প্রেসে মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩১টি গান আছে। তন্মধ্যে ৫, ৮, ১১, ১৬ ও ২৯নং গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৩২। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে সালবেগের ২টি, ফতনের ১টি, সেখ ভিখনের ১টি, সাহ আকবরের ১টি, ফকির হবিবের একটি, কবীরের ১টি, সেখ লালের ১টি, নশির মামুদের ২টি, মর্ত্তুজার ৪টি, মোট ১৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

৩৩। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, প্রথম খণ্ড'—ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত। ইহাতে সৈয়দ মর্ত্তুজার ২৩টি পদ আছে।

৩৪। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, দ্বিতীয় খণ্ড'—ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত, ১৩১১ বাং মুদ্রিত। ইহাতে আলীরাজার ৩১টি পদ আছে।

৩৫। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, তৃতীয় খণ্ড'—ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত, ১৩১১ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থে আলাওলের ৫টি, মির ফএজোল্লার ৫টি, সৈয়দ আইনদ্দিনের ৫টি, সৈয়দ নাছিরদ্দিনের ২টি, নাছির মহম্মদের ৫টি, নশির মামুদের ২টি, সেরচান্দের ১টি, এবাদোল্লার ১টি, আবাল ফকিরের ১টি, মোছনআলীর ১টি, মহম্মদ হানিফের ১টি, আলিমদ্দিনের ১টি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-পদ আছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলাওলের ১টি, সৈয়দ আইনদ্দিনের ৩টি, সৈয়দ নাছিরদ্দিনের ২টি, নাছির মহম্মদের ২টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৬। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, চতুর্থ খণ্ড'—ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত, ১৩১৩ বাং মুদ্রিত। ইহাতে মোহম্মদআলীর ১টি, চাম্পাগাজীর ২টি, হাসিমের ২টি, কমরআলীর ১৬টি, বক্সাআলীর ১টি, আলী মিঞার ১টি, সালবেগের ২টি, আমানের ১টি, আপঝল আলীর ২টি, ফকির ওহাবের ২টি, দুলা মিঞার ১টি, গয়াজের ৩টি, সমসেরের ১টি, লালবেগের ১টি, ফতনের ১টি, সেখ ভিখনের ১টি, সাহ আকবরের ১টি, ফকির হবিবের ১টি, কবীরের ১টি, সেখ লালের ১টি, পির মোহম্মদের ১টি, বদিয়ুদ্দিনের ১টি, মনোহরের ১টি, হাসমত আলীর ১টি, সৈয়দ সুলতানের ৩টি রাধাকৃষ্ণ-লীলাপদ আছে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে রাধাকৃষ্ণ-লীলা গান নহে, এমন একটি হাসমতের গান উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৭। মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য—অধ্যাপক আহমদ শরীফ, এম. এ.-সঙ্কলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকার'

চতুর্থ বর্ষের ১ম সংখ্যায় (১৩৬৭ বাং) প্রকাশিত। ইহাতে মোট ৪৩৫টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৩টি পদে কোন ভণিতা নাই। "ভণিতা হীন পদগুলো হয়তো মুসলিম রচিত"—মনে করিয়া এই সঙ্কলনে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভণিতাযুক্ত পদ ৩৪২টি, তন্মধ্যে ৫টি পদ দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে :—পদসংখ্যা ৪—১৮১ ; ৩৩—২৯৬ ; ৫৬—২১৪ ; ৭৫—২০৫ ; ১৪৮—২৬৮ ; অতএব মোট ভণিতাযুক্ত পদসংখ্যা ৩৩৭টি। তন্মধ্যে একাধিক হিন্দু কবির পদও সংগৃহীত হইয়াছে অনুমান হয় ; যথা :—নব বালক (৮২নং পদ) ও জীবন (১২৯ নং পদ), ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদ কয়টি। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত ১৪ জন কবির এক একটি পদ বর্ত্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

১। আবদুল মালী (পদ সং ৩৩৩)
২। এর্শাদুল্লাহ (১২৭)
৩। কাশিম (২৪৪)
৪। চামারু (৭৮)
৫। দানেশ (২৪৮)
৬। নওয়াজিস (৩৭৮)
৭। নজর মোহাম্মদ (৮)
৮। ফকীর শাহ (৩৩১)
৯। বদিয়ুজ্জমা (৩২৫)
১০। বহরাম (সংযোজন ১৯৫ পৃঃ)
১১। মর্ত্তুজা গাজী (পদ সং ২১৮)
১২। মোহাম্মদ পরাণ (১০)
১৩। রেয়াছক (১১)
১৪। সোন্দর ফকীর (৩৩৫)

৩৮। 'মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুযানীর গীত'—রজবউদ্দীন-প্রণীত। এই গ্রন্থের ৮টি গান [পৃঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯] রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৩৯। 'যৌবন বাহার'—আকবর আলী-বিরচিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২টি গান আছে। তন্মধ্যে ৫, ৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং, মোট ৯টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৪০। 'রত্ন-সাগর, প্রথম খণ্ড' (কালাশাহার গানের বহি)—আবদুল রজ্জাক ওরফে কালাশাহা-প্রণীত। শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৩৪৭ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৪টি গান আছে। তন্মধ্যে ১৩, ১৫, ২২, ২৩, ৪০, ৪৪, ৬৫ ও ৬৬ নং, মোট ৮টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৪১। 'রাগ বাউল, প্রথম ভাগ'—মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত, ১৩৩৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান কবি-রচিত সর্ব্বসমেত ৪২টি গান আছে। তন্মধ্যে সৈয়দ নিয়ামত-রচিত ২৮নং গান ও ইরকান-রচিত ৩০নং গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪২। 'রাগ মারিফত [তত্ত্ব-সঙ্গীত], প্রথম ভাগ'—মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত, ১৩৩৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান কবি-রচিত সর্ব্বসমেত ৩৮টি গান আছে। তন্মধ্যে ওহাব-রচিত ২নং, খলিল-রচিত ৬নং, রহিমুদ্দিন-রচিত ৭ ও ১৪নং, মুছা-রচিত ১৮ নং, নেমত হোসেন-রচিত ১৯ ও ২০ নং, খাতাসা-রচিত ২২নং, নজির-রচিত ২৩ ও ২৬নং, সৈয়দ আলী-রচিত ৩০নং এবং সদাই সাহ-রচিত ৩৫নং—এই মোট ১২টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪৩। 'সমছুল ইছলাম আসিকে বারাম'—আশ্রফ আলী-প্রণীত, শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৩৩৮ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩৬টি 'নছিহত' ও ১০টি বয়ান আছে। তন্মধ্যে ২০নং 'নছিহত' রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৪৪। 'হকিকতে মারিফত'—উছমান আলী-প্রণীত, শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে ১৩৪২ বাং মুদ্রিত। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ৫৮টি গান আছে। তন্মধ্যে ২৫ ও ৫৪-সংখ্যক গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪৫। 'হকিকতে সিতারা' [ভাগ্যের গতি]—আরকুম উল্লা-রচিত, ১৩৪৭ বাং মুদ্রিত। ইহার সর্ব্বসমেত ৯৫টি গানের মধ্যে ১৭টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক। এই গ্রন্থখানিও 'এস্কে গোলজারে'র অনুরূপ ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৪৬। 'হজরত শাহ ছিদ্দেক তবকাতী, ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবন-চরিত'—মৌলবী ফজল উদ্দীন আহম্মদ ওরফে ফজলুর রহমান ও সুনা-মিয়া পীরসাহেব-রচিত। এই গ্রন্থে ফজল উদ্দীন-রচিত মাত্র দুইটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীত আছে। এই গ্রন্থখানিও ফার্সী রীতিতে মুদ্রিত।

৪৭। 'হাছন উদাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড'—দেওয়ান হাছন রজা চৌধুরী-প্রণীত, ২য় সংস্করণ, ১৩৩৩ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২০৬টি গান আছে। তন্মধ্যে মোট ৩৫টি গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪৮। 'হৃদয়-বীণা, প্রথম খণ্ড'—মোতাহির আলী-রচিত, ১৯৩৯ ইং মুদ্রিত। ইহার সর্ব্বসমেত ২১টি গানের মধ্যে ১৪নং গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক।

৪৯। A History of Brajabuli Literature, by Sukumar Sen, M. A., 1935. (C. U. Publication.) ইহাতে নশির মামুদের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫০। Typical Selections from Oriya Literature, Vol. II, by B. C. Mazumder, B. A., B. L. (C. U. Publication.) ইহাতে সালবেগের তিনটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাপদ মুদ্রিত হইয়াছে।

যে-সকল প্রবন্ধাদি হইতে মুসলমান কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

১। 'অপ্রকাশিত নাগরী পুস্তক, নূর নছিয়ত'—আবদুল জব্বার-লিখিত, 'শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ২য় বর্ষ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১২৩ [১৩৪৪ মাঘ]। ইহাতে শাহনূরের কয়েকটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

২। 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'সাহিত্য-সংহিতা', ১৩০৭ চৈত্র, পৃঃ ৭৫০; ১৩০৮ আষাঢ়, পৃঃ ১৭৯; ১৩০৮ শ্রাবণ, পৃঃ ২৩৯; ১৩০৯ আষাঢ় ও শ্রাবণ, পৃঃ ১৯৯; ১৩১০ আষাঢ় ও শ্রাবণ, পৃঃ ১৯৮; ১৩১০ ভাদ্র, পৃঃ ২৯০; ১৩১০ আশ্বিন, পৃঃ ২৯৩। ইহাতে সর্ফতোল্লা ও আলিরাজা প্রভৃতি কয়েকজনের পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। 'অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী'—আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-লিখিত, 'ভারতবর্ষ', ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৭৯৫।

৪। 'অসমিয়া মুসলমানী পুথী'—ছাহ ছৈয়দ হাছান আলি-লিখিত, 'আবাহন', শক ১৮৫৪ আঘোন, পৃঃ ২২৩। ইহাতে গোলাম হুছনের একটি বৈষ্ণব-পদ আছে।

৫। 'কবি সৈয়দ সোলতান'—ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক, এম. এ., পি. এচ. ডি.-লিখিত, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৪১, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৮। ইহাতে সোলতানের কয়েকটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। 'কবি সৈয়দ সোলতান—আলোচনা'—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ.-লিখিত, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৫১, ৩য় ও ৪র্থ সং, পৃঃ ৯৬।

৭। 'কবি হারি পণ্ডিত'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'পূর্ণিমা' ১০ম বর্ষ, ৩য় সং, পৃঃ ৯২ ; ১৩০৯ আষাঢ়।

৮। 'কৃষ্ণভক্ত মুসলমান'—রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ-লিখিত, 'প্রতিভা' ১৩২৮ কার্ত্তিক, পৃঃ ২৬৫।

৯। 'গ্রামের গান'—আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী-সংগৃহীত, 'বাংলার শক্তি', ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃঃ ১০৭ ; ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, পৃঃ ৩১৮। ইহাতে উদাসী [ইদ্রিছ আলী]র গান মুদ্রিত হইয়াছে।

১০। 'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'আলো', ১৩০৬ কার্ত্তিক, পৃঃ ১০৭ ; ১৩০৭ আষাঢ়, পৃঃ ১২৯। ইহাতে আলিরাজার গান মুদ্রিত হইয়াছে।

১১। 'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'সাহিত্য', ১৩১০ ফাল্গুন, পৃঃ ৬৬৪। ইহাতে সালবেগের 'কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া' পদটি আছে।

১২। 'পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত'—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত, 'প্রবর্ত্তক', ১৩৩৭ কার্ত্তিক, পৃঃ ৬১৬। এই প্রবন্ধে জালালউদ্দীন-রচিত কয়েকটি বাউলসঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মোছলমান'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'আলএসলাম', ১৩২৫ আশ্বিন, কার্ত্তিক (?), পৃঃ ৩১৫, ৩৮৭।

১৪। 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—মুন্সী এক্রামদ্দিন-লিখিত, 'বীরভূমি', ১ম বর্ষ, ১ম সং, পৃঃ ৩২।

১৫। 'বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—কনক বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত, 'বঙ্গশ্রী', ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৬৬৪।

১৬। 'বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'ভারতবর্ষ', ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭৩৪। এই প্রবন্ধে 'রাগনামা' হইতে নিম্নোক্ত পাঁচজন মুসলমান কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা :—মীর ফয়জুল্লা, ফতন, সৈয়দ আইনদ্দিন, মোহাম্মদ হাসিম ও মনুব্বর।

১৭। 'বৈষ্ণব মুসলমান'—স্বামী ভূমানন্দ-লিখিত, 'বঙ্গশ্রী', ১৩৪৪ চৈত্র পৃঃ ৩৮৭ ; ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃঃ ৫০২।

১৮। 'ভক্ত কবি লালমামুদ'—বিজয়নারায়ণ আচার্য্য-লিখিত, 'সৌরভ' ১৩২৩ বৈশাখ, পৃঃ ২০৩। ইহাতে লালমামুদ-রচিত চারিটি গান মুদ্রিত হইয়াছে।

*১৯। 'মহাকবি আলাওল প্রসঙ্গ'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'মাসিক মোহাম্মদী', ১৩৪৬ বৈশাখ, পৃঃ ৪৫০।

২০। 'মুসলমান কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলী'—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ.-লিখিত 'শ্রীভারতী', ১৩৫০ আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৃঃ ৯০, ১৩৩। এই দুই সংখ্যায় শাহানূরের ১৪টি গান মুদ্রিত হইয়াছে।

২১। 'মুসলমান কবির বৈষ্ণব-পদাবলী'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ১৩২৪ ভাদ্র ও আশ্বিন, পৃঃ ১৮০। ইহাতে ১০ জন মুসলমান কবি-রচিত ১১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২২। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-লিখিত, 'দাসী' ১৮৯৬ এপ্রিল, পৃঃ ২১৫।

২৩। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-লিখিত, 'সাহিত্য', ১২৯৯ ভাদ্র, পৃঃ ৩২১। এই প্রবন্ধে পদকল্পতরু হইতে 'নাগরী নাগরী নাগরী' ও 'চলত রাম সুন্দর-শ্যাম' পদদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৪। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—ব্রজসুন্দর সান্যাল-লিখিত, 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্য-বিবরণী', রাজসাহী অধিবেশন, পৃঃ ৮০।

২৫। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—রাধাবল্লভ দে-লিখিত, 'সুবর্ণবণিক সমাচার', ১৩৩২ বৈশাখ, পৃঃ ২১৪ ; ঐ আষাঢ়, পৃঃ ৩০৬। ইহাতে আকবর, কবীর, নসীর মামুদ, ভিখন, মর্ত্তুজা ও সেখ লালের পদ আছে।

২৬। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি আলীরাজা ও মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ৩য় খণ্ড' [গ্রন্থ-সমালোচনা],—'নবনূর', ১৩১১ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৮৩।

২৭। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবির ধর্ম্মমত'—প্রিয়লাল দাস, এম. এ., বি. এল.-লিখিত, 'অর্ঘ্য', ১৩২৪ মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, পৃঃ ৪২৫।

২৮। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয়'—প্রিয়লাল দাস, এম. এ. ,বি. এল.-লিখিত, 'অর্ঘ্য',১৩২৪ আশ্বিন, পৃঃ ২৮৯।

২৯। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা' [গ্রন্থ সমালোচনা]—'নবনূর', ১৩১১ কার্ত্তিক, পৃঃ ২৯১।

৩০। 'লালন ফকিরের গান'—অনিলকুমার চৌধুরী, এম. এ.-লিখিত, 'দেশ' ১৩৫০, ২রা পৌষ শনিবার, পৃঃ ১৭১।

৩০ (ক)। লোক-সাহিত্যে বিরহ-সঙ্গীত—মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-লিখিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, পৃঃ ৪০।

৩০ (খ)। শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি মরহুমা ছহিফা বাঁনু—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস-লিখিত, আল্ ইস্লাহ, ২৮ বর্ষ ৭ম-৯ম সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬৬, পৃঃ ১৭৬।

৩১। 'সৈয়দ মর্ত্তুজা'—নিখিলনাথ রায়-লিখিত, 'সুধা', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১১০ [১৩০৮ মাঘ]।

৩২। 'সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী'—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-লিখিত, 'সাহিত্য', ১৩১০ পৌষ, পৃঃ ৫৫২। ইহাতে মর্ত্তুজার দুইটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তিকার বিষয়-বস্তু আলোচনা-কালে যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

কবীর ১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড—ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩১৭ বাং।

কীর্ত্তিলতা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৩১ বাং।

গোপাল ঠাকুরের পদাবলী—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., ১৩৫২ বাং।

গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—শুকুর মামুদ।

গোরক্ষ বিজয়—কবি ফএজুল্লা।

চর্য্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ., ১৯৪৩ ইং।

চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত, চৈতন্যাব্দ ৪১৪।

দাদূ—ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৪২ বাং।

বৃন্দাবন কথা—পুলিনবিহারী দত্ত, ১৩২৬ বাং।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১২৮২ বাং।

ভগবদ্গীতা—প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ১৩৩১ বাং।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৯১ বাং।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন, ১৯৩০ ইং।

মাথুর কথা—পুলিনবিহারী দত্ত, ১৩৩৩ বাং।

মানুষের ধর্ম্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৩ ইং।

রামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ—শ্রীম-কথিত, ১৩১৬ বাং।
রামপ্রসাদ—বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ১২৯৮ বাং।
সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম সংস্করণ, ১৩২৯ বাং।
হারামণি—মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ., ১৯৪২ ইং।
Influence of Islam on Indian Culture—Tarachand, M. A., D. Phil., 1936.
Islamic Mysticism—R. A. Nicholson.
Sayings of Muhammad—Sir A. Suhrawardy, Calcutta, 1938.

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ কথা বহুবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিতা বা গানগুলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বলা যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অন্যত্র আমরা খানিকটা একটা প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিকটা অনুকরণ বা অনুসরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থূল-সূক্ষ্ম হস্তাবলেপন লক্ষ্য করিতে পারিব। সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই গানগুলির হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রম-বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

যে-সকল মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি বা বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবি ছিলেন এ-কথা আমরা স্বীকার করি না—যেমন করিয়া স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহার ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা তাহার সাম্প্রদায়িক একটি ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির একটি চিত্তপ্রবণতা রূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীর রূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাশ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহা একটা বড় 'বাঙালী সমাজ'; তাহা

'বাঙালী সমাজ' এই জন্ম যে সেই সমাজের অন্তর্ভূক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান রূপে অত্যন্তভাবে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লয় নাই ; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন সাংস্কৃতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রবণতার বিচারে তাহাদের একটা অখণ্ড 'বাঙালী' পরিচয় ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য, নাথ-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন সহজিয়া-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; তাহার ফলে বৃহৎ বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান আদি রূপে নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না তাহার সেই সংস্কৃতিপ্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক পৃথক ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। সেই কারণে দেখিতে পাই বাংলাদেশের হিন্দুও যেমন 'বাঙালী হিন্দু', বাংলাদেশের মুসলমানও তেমনই 'বাঙালী মুসলমান', বাংলাদেশের বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানগণেরও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে।

ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্য' রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবৎচৈতন্যের মূর্তবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইলেন বাঙালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপ্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তহীন ন্যায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতিস্মৃতি-নির্ধারিত আচার বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণত করিয়া রাখিলেও চলিবে না ; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবৎ-চৈতন্যের উপরে যাহা সহজভাবে জীব ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেম-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়া তোলে। চৈতন্যদেবের জীবন ও বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মের মূল কথা যেটি তাহা সমগ্র বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িল অসংখ্য গানে গানে। তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিল সর্বস্তরের বাঙালী জাতিরই মননের উপরে—অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে।

বাঙালী-চিত্তের উপরে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমন ভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যত প্রেমের কথা তাহা ঐ রাধাকৃষ্ণের বাঁধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাষায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির দিক হইতেও জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে। যেমন—

আয় ধনী কুজনী কি মোক শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়
যো বিধি লিখিল ললাটং॥
না বোল না বোল, ধাই, অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি॥
মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মূরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ-পান
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং॥...
দুরন্ত দুর্মতি দূতি দূতীপনা দূর করি
চিন্তহ মোর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানং॥[১]

জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদও দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের মধ্যে। যেমন—

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং।

(১) 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১৮-১৯ পৃঃ।

অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং ॥
রাণী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর
তথাপি ন চেতন ময়না চেতং ॥
বকফুল মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মৃগ ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং ॥ ইত্যাদি।[২]

উদ্ধৃত পদগুলির কাব্যমূল্যের কোনও কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না। অনুকরণ হিসাবেও এগুলি হয়ত অসার্থক ; কিন্তু অন্য একটি দিক হইতে ইহারা সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাতিশয়ী ছিল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১০২ জন মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধৃতির পরে তিনি এই-সকল মুসলমান কবিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে এই কবিগণের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন ; কিন্তু অধিকাংশই হইলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এই সময়ের মধ্যে ধর্মমননের ক্ষেত্রে কতগুলি ভাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। উচ্চ কোটির বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমতের ভিতরে একটা আশ্চর্য ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুস্বীকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই ভাবৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সমতা কিভাবে এই মুসলমান কবিগণ লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

(২) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১-২২।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিধর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিধর্মই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান কবিগণরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতে অনেকখানি পৃথক্ হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার যত প্রেমলীলা তাহার ভিতরে মানুষের কোনও স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে ; জীব সেখানে লীলা-পরিকরভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলার কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবাসনাও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে ভক্তিধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া মিলিবার আকাঙ্ক্ষা করি ইহা আমাদের হৃদয়-সম্মত হইলেও বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের আলবারভক্তগণ যেরূপ নিজেদের নায়িকাভাবে পরিভাবিত করিয়া পরমদয়িত ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছেন এবং মধুররসাশ্রিত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাহার আভাস মিলিবে না। হিন্দীর ভক্তকবি মীরা যেমন করিয়া নিশিদিন প্রেমবিহ্বলা হইয়া তাঁহার পরম 'প্রীতম' গিরিধারীলালের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণও স্থানে স্থানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অংশীদার হইবার ব্যাকুল বাসনা জানাইয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় তাহার কোথাও আভাস নাই, থাকিবারও কথা নহে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা হইল সখীর সখী যে মঞ্জরীগণ তাঁহাদেরই 'অনুগা' ভাবে ; সখীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মঞ্জরীর 'অনুগা'-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মের 'সাধ্য' ও 'সাধন' সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব বাংলাদেশে অবশ্য ষোড়শ

শতকে গড়িয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিগণের ধ্যান মননে; কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টিটি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। জয়দেব তাঁহার সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে লীলা-কীর্ত্তন করিয়া শুধু লীলার জয়-জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অংশীদার হইতে চাহিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও আমরা সেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কবিগণের তো কথাই নাই। কবিগণ কোনও ধার্মিক বা দার্শনিক সচেতনতা লইয়াই যে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, এইটাই দেখা দিয়াছে বাংলাদেশের চলতি ভঙ্গিরূপে। হয়ত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকেও।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, বৈষ্ণব ধার্মিক এবং দার্শনিকগণেরও ইহাই তত্ত্বসম্মত আদর্শ এবং সাধন-প্রণালী বটে; কিন্তু বাংলার বৃহৎ জনসমাজে রাধাকৃষ্ণলীলার ফলশ্রুতি কি? কোনও আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা-সম্বলিত কীর্ত্তনপদাবলী গীত হয় তখন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন বৃন্দাবনের পরিকররূপে পরিভাবিত করিয়া লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অনুভবের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আস্বাদন করিতেছেন তাহা স্মরণ-মননের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা-কীর্তনের ফলশ্রুতি দেখা দেয় ভিন্ন-ভাবে। শ্রোতা যেখানে আদৌ ধর্মবাসিতচিত্ত নহেন, সেখানে ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে রাধার সকল প্রেমের আর্তি কৃষ্ণৈকচিত্ত পরমভক্তের হৃদয়-আর্তি বলিয়াই গৃহীত হইবে; রাধার সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল বিঘ্নবাধাকে অতিক্রম করিয়া যে কৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষা তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতিচ্ছবিতেই গৃহীত হইবে। ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রুতি হয়ত নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার প্রেরণায় পর্যবসিত হইবে।

বাঙালী হিন্দুগণের মধ্যে যত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবদর্শনসম্মত বৈষ্ণব হোন বা না হোন, একই ঐতিহ্যধারা দ্বারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাঁহারা মোটামুটিভাবে সেই মুখ্য ধারাকেই অনুসরণ

করিয়াছেন ; কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে ; কারণ তাঁহারা চৈতন্যপ্রবর্তিত একটা সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনও স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই-সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরমস্বরূপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি-লীলার প্রধান শরিক—লীলা-দোসর। কিন্তু লীলার পাকে পড়িয়াও 'এক' তাঁহার সেই পরম প্রেমস্বরূপতাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই—কিন্তু জীব তাহার প্রেম-স্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবকে তাহার আপাতপৃথক্ সত্যকে ভুলিয়া যাইতে হইবে—ইহাই তাহার বড় সাধনা। যিনি মূল প্রেম-স্বরূপ তিনিই ত হইলেন পরম দয়িত—সেই পরম দয়িতের 'প্রেম-দিবানী' হইয়া উঠিতে হইবে জীবকে। প্রেম-সমাধিতে ('ফানা') যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাহাই সুগম করিয়া দেয় অনন্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথে।

বাংলার যে সূফীধর্ম—শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে সূফীধর্ম—ইহা একটি মিশ্রধর্ম, ইহার ভিতরে পারস্যের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেম-ধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও সূফীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সূফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেম-ধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিশাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেমসাধক-গণের পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদকরূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয়

মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাচ্ছলে বৈষ্ণব কবিগণ নিজেদের কিছু কিছু মন্তব্যাদি যোগ করিয়া দিয়াছেন—তাহার মধ্যেই তাঁহাদের ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব। আমরা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে পদ-সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কৃষ্ণকে বলা হইতেছে—

তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা॥ ৩ সংখ্যক

ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহার জন্য পালঙ্ক সাজাইয়া রাখিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সার্বজনীন 'প্রভু'রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই 'প্রভু'টির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবগণের 'কৃষ্ণ', সাধারণ হিন্দুগণের 'হরি', মুসলমানগণের 'খোদা' এবং খ্রীষ্টানগণের 'গড্' ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সার্বজনীন 'প্রভু'র উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই 'প্রভু ভাব রাত্রি-দিনে' কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে—অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ডী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের সাধারণ পরম-দয়িতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও ব্রজকুঞ্জ-নিকুঞ্জ হইতে মুক্তি পাইয়া সকল 'প্রেম-দিবানী' সাধকের সহিত একাত্ম হইয়া গেল; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও বাধা রহিল না, তখন কবি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—

আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা॥

কবি আকবর আলীর পূর্বরাগের (স্বপ্নদর্শন) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য—

একা ঘরে শুইয়া থাকি, সুতিলে স্বপন দেখি।
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া ॥
ছারাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া ॥ ৫ সং

এখানেও বলা যাইতে পারে, 'ছারাল' আকবর আলী অতি সহজভাবেই কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, অথবা বলিতে পারি নিজেকে রাধা-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইবার দৃষ্টান্ত বহু কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেকে রাধার ন্যায় প্রেম-দিবানী মনে করিয়াই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা রাধাকে—

তোরে মিনয় করি, চরণ ধরি, বৈলা সে গো রাই ;
হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই।

যুগে যুগে দেশে দেশের সকল 'প্রেম-পাগলিনী'গণের সঙ্গে রাধার যে একটি সাজাত্য রহিয়াছে, অথবা রাধা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের ব্যঞ্জনা অনেক পদের মধ্যেই লাভ করি ; এই ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করিয়া এই পদগুলিতে রাধা ও পদকর্তা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নিম্নে যে কবিগণের ভণিতাসহ পদাংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই সত্য লক্ষণীয়।

যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া।
ঐ বন্দের চরণে দিব কুলমান সঁপিয়া ॥
আবুল হছনে বলে সে রূপ না পাইয়া।
নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ১১ সং

দেখা দিয়া না দেয় দেখা একি বিষম জ্বালা।
ঘরের বৈরী যৌবন পতি বাইরে চিকণ কালা ॥
অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী।
বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥ ১৮ সং

কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান।
প্রেমের পোড়া, আঙ্গার কালা, কালা গো কালায়।
চউকের পুতুলা কালা আর যে আছমান।
উদাসীয়ার অঙ্গ কালা না পাইয়া তোমার নিশান॥ ২২ সং

যখনে পিরিতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্নভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া আনলেতে তুণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া॥ ৩০ সং

চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥ ৪০ সং

মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥ ৭০ সং

আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, খণ্ডিতাভাবের পদের ভিতরে রাধার বাম্যতার স্থলে মিনতি দেখা দিয়াছে।

আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে॥
মমের বাতি, সারা রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জ্বলে,
দয়া গুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কুলে॥

কিন্তু এই পদটির শেষেই যখন দেখিতে পাই—

পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে,
না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ॥

তখন এই ভণিতা ও মন্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপার্শ্বিকতা এবং অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বদলাইয়া দিল। শিশুকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবন্ধুকে পাওয়া যায় না কথার ইঙ্গিত কোন্ দিকে? জীবনের প্রভাত হইতে প্রেমের পথে না চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী না করিয়া লইলে, জীবন-নিশাতে কখনও সেই প্রাণবন্ধুর দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাধার যে 'আজ নিশাকালে' তাহার জীবনকুঞ্জে শ্যামকে আহ্বান ইহার সুরের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির পদের সাধারণ সুরের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণলীলার যত বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে নৌকা-লীলা বা নৌকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে যতদূর আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়, অন্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে ইহা রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র—ভক্ত সাধককে ইহাকেও লীলা-পরিকরভাবে দূর হইতে দর্শন ও আস্বাদন করিতে হইবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রভাতবেলা ওপার হইতে এপারে আসিয়া সারাদিন বিষয়কর্মে রত থাকিয়া বেলা শেষে আবার ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 'পাড়ী'র জন্য খেয়াঘাটে বসিয়া থাকা—এই ঘটনাটি বহুদিন পূর্ব হইতেই বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যাত্ম ভাব উদ্রিক্ত করিয়া আসিয়াছে; পাড়ের জন্য অপেক্ষা বাঙালীচিত্তে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরপারের অজ্ঞাত রহস্য এবং অজানা 'পাড়ী'র কাছে আত্মসমর্পণের ভাবকেই উদ্রিক্ত করিয়াছে। 'উম্মর' কবি রচিত একটি পদে দেখি—

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।
প্রেম সাগরে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাতার ॥···

উম্মর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো।
এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মরে কর পার ॥
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ॥ ২৩ সং

পদটি নৌকা-বিলাসের ভিতরেই বাঙালীর সেই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব বলিতেছি এইজন্য পদকর্তাগণ যেভাব অবলম্বন করিয়াই পদ-রচনা করিয়া থাকুন না কেন, কীর্তন-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্মব্যঞ্জনাতেই মুগ্ধ করে। কীর্তনীয়াগণ যখন আখরের দ্বারা পদগুলির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও আধ্যাত্মিকভাবেই পদগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট যখন পারের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা দু আনা করিয়া দর কষাকষি করিতে থাকে; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধা নয়, আসরস্থ সকলের প্রতি উপদেশ দিয়া সুরে বলেন, 'ষোল আনাই ঢেলে দাও—গোবিন্দায় নমঃ বলে ষোল আনাই ঢেলে দাও'। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই সুখী। সমস্ত জিনিসটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় কীর্তন-আসরেও নৌকা-বিলাসের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোন্ দিকে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানদাসেরও একটি পদ উদ্ধার করা যাইতে পারে; তিনিও নৌকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়— পদটি এই—

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥…
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবহ বিষাদ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের চট্টগ্রামবাসী আলিরাজা (ওরফে কানু ফকির) প্রেম ও যোগধর্ম মিশ্রিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থখানিতে জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিয় মুসলমান ধর্মের

ভাবধারার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি। এই আলিরাজার একটি পদ আছে—

> শুন সখি সার কথা মোর।
> কুলবধু প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥
> সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম।
> জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম ॥
> মোর জিউ সে কি মতে লই গেল হরি।
> শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
> গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে।
> প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রজের নাগর 'কালা'র যে 'কুলবধূ প্রাণি' হরণ করা লীলা তাহা যে পরব্যোমের ওপারে কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই চলিতেছে 'নাগর কালা'র এই প্রেমলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিয়া চিত্তশুদ্ধির সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে ইরপান কবির একটি পদেও—

> ছাবাল সা ইরপানে কইন বন্ধু আমায় বংশীধারী।
> ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরি ॥

২০ সং

আলিরাজার পূর্বোদ্ধৃত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলায়েত হোসেনের (ইনি কালীপ্রসন্ন ভণিতায় শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত রচনা করিতেন) একটি পদেও সেই তত্ত্বের সন্ধান পাই।—

> প্রেম কি গাছের ফল পাড়িবে করিয়া বল।
> দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা ॥
> কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে
> চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর লীলাখেলা ॥

কৃষ্ণের মায়ার লীলাখেলা স্বর্গ-মর্ত্য-ভূমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সে কথা স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার প্রেমের লীলাখেলাও স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে চলিতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না (সহজিয়াগণ

ব্যতীত)। কিন্তু গৌড়ীয় মুসলমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই দ্বিধা ছিল না,— কারণ—

মনরে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়।
সঙ্কটতারণ আমার মুর্শিদ শ্যামরায় ॥ ৫৫ সং

শ্যামরায় যে শুধু অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর নয়—সে যে ব্যক্তিজীবনের 'মুর্শিদ'। মুর্শিদ-ভজনেও শ্যামরায়কে পাওয়া যায়, আবার পরম মুর্শিদও হইল শ্যামরায়। মন্সুঅর কবি বলিয়াছেন—

নয়ানে লাগিল রূপ আসি আচুম্বিত।
জাগিতে হারায়িলুঁ হরি শোকে দহে চিত ॥
কি দেখিলুঁ কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মন্সুঅর ॥ ৭২ সং

মিয়াধনের একটি গানে রাধাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আর্তি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে—

প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা।
আমি দাসী চির দোষী শ্যাম পিরিতের মরা ॥
বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা ॥ ৭৫ সং

শিতালং ফকির তাঁহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক ভক্তকে প্রেম-পাগলিনী রাধার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব 'পিরীতে'র চিহ্নই হইল এই, সে 'সদায় থাকে উদাসিনী'—আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই তাহার 'দিবানিশি বেকরার'—দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলতা।

ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে জলধারা দুই নয়নে গো
এগো ছির ঘুরে প্রেমধুন্ধে
দিবানিশি ইস্তিজার।

হাসি খুসি নাই তার মনে সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো
এগো লাজভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥ ৮৮ সং

আমরা বৈষ্ণবগণের রাধার এই বর্ণনা পাইয়াছি, আর পাইয়াছি শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ বর্ণনা; সুফী কবিগণের মধ্যে 'প্রেম দিবানী'র এই বর্ণনা অনেক

পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলার বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে।

বাংলাদেশের সহজ প্রেম সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। সে প্রভাব সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাসে যে পরম সত্যরূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়—সে 'ঘরে'র মধ্যেই রহিয়াছে, আমাদের দেহই হইল সেই 'ঘর'। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের গানগুলির মধ্যেই আমরা এই ভাবটির প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি, তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন, 'দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই'—'এই দেহেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ—পণ্ডিতেরা সে কথা জানেন না'। তাঁহারা বলিয়াছেন—

অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো।
যে তহি জানই সো তহি মুক্কো॥

'অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।'

আবার—

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই।

'সে আছে (দেহ) ঘরে—তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে! পতি দেখিতেছ, (তাহার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে!'

বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূলসুর ছিল—'বস্তু আছে দেহ বর্তমানে'—সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীয় সূফী সাধকগণও এই সত্যটি গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলার বাউলরা ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলার মুসলমান কবিগণও এই ভাবটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব—দুই-ই এক—ঘর-ঘরিণী রূপে দুইয়ের লীলা,—কে ঘর কে ঘরিণী বলা শক্ত; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষ্ণ হইবে গৃহী, আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়—রাধা তবে ঘরিণী। মোটামুটি ভাবে একই অদ্বয়তত্ত্বের ঘর-ঘরিণী রূপে লীলা।

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন॥

কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিষ্ঠুর রাধা কানু হইবা নাশ ॥

ইহার পরেই কবি বলিতেছেন—

রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাও।
তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও ॥

এই যে দেহ-দেহী—মূর্ত ও অমূর্তের—সীমা ও অসীমের লীলা ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের দেহই হইল রাধা—তাহার মধ্যে যিনি 'রমণ' তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ। বাহিরের এই রূপ হইল রাধা—তাহার ভিতরকার স্বরূপই ত কৃষ্ণ। রূপ চায় সেই স্বরূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাইত রাধার কৃষ্ণান্বেষণ। ঘরের মালিককেই যদি খুঁজিয়া বাহির করা না গেল তবে শূন্য ঘরের আর কি সার্থকতা! আবার এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কৃষ্ণ। সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে—

বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া।
আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া ॥ ২৬ সং

এই ভাবটিও যেমন পাওয়া যায়, তেমনিই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে দেহ-খাঁচায় কৃষ্ণই হইল সেই বাউলদের বর্ণিত খাঁচার ভিতরকার 'অচিন পাখি'। মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখির পিঞ্জর। খলিল কবি বলিয়াছেন, যতই প্রেম করিতে চেষ্টা করি, 'চঞ্চল কানুরায়'; কখন যে পাখি কোথায় ছুটিয়া পালাইবে ঠিক নাই।—

সখি গো অধম খলিলে বলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। ৩৪ সং

বদিয়ুদ্দিন বলিয়াছেন

তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।

এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
তনুর অন্তরে পশি, মন্থুরা রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবারে আর লক্ষ্য নাই ॥ ৬৪নং

এখানে 'অবলা মন্দির' বা রাধার মন্দির হইল দেহ, এই 'তনুর অন্তরে' রহিয়াছে 'মন্থুরা'—রূপের অন্তরে স্বরূপ। হুছন কবির গানেও দেখি, এই সত্যের প্রতিধ্বনি—'দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।' সিরতাজ কবির গানে দেখি, এই 'ঘরের সোআমী'র (স্বামীর) যে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে যে অন্তরের মধ্যে দেখা দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না, ইহাই ত চরম বেদনা।—

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোআমী হাসিয়া না বোলাএ
মুঞি অপরাধী দুখী ॥
সই সই ন জানি কি দোষে পিআ মোঁরে রোষে
নিদআ হৃদএ পিউ।
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ ॥ ৯৩নং

প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের মিশ্রণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, সুফীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধনা যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই যোগসাধনা হইল মুখ্যতঃ দেহবিশুদ্ধি ও চিত্তবিশুদ্ধির জন্য। এই বিশুদ্ধি সাধনের দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবরাও বলিয়াছেন,—'প্রাণ মন ঐক্য ক'রে ডাক যশোদা-কুমারে।' এই প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই হইল প্রেমসাধনায় যোগ-সাধনার প্রয়োজন। মুসলমান কবিগণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গানের মধ্যে

অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। গোলাম হুছনের একটি গান আছে—

আকাষ্ঠা কাষ্টের নাওখানি যবুনার মাঝ।
কাঙ্কাকুরা কালা নিশান স্থধু রাধার সাজ॥
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও॥
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাশিকায় দাঁড় বাইও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও॥
গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গমুখে যায়।
স্থপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায়॥ ৩৮ সং

এখানে 'নাওখানি' হইল দেহ নাওখানি, যমুনা এখানে কাল-প্রবাহ। 'আকাষ্ঠা কাষ্টের নাও' অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেহ (অপক্ব দেহ)—স্থতরাং তাহার 'কুরা' অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিও 'কাঙ্কা'—অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের (অমজবুত); কালো নিশানও সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক; মোটের উপরে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধিলাভ ঘটে নাই, বাহিরে শুধু 'রাধার সাজ'। 'আখির মাঝে আখি গুলি'র ইঙ্গিত 'আবৃতচক্ষুঃ' হইবার দিকে, 'কর্ণের মাঝে কর্ণ' প্রভৃতির ইঙ্গিতও এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখীনতার দিকে; 'নাঁয়ের মাঝে আছে হরি' কথার তাৎপর্য দেহের মধ্যে পরম দয়িতকে আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি করা। 'নাশিকায় দাঁড় বাইও' কথার ইঙ্গিত শ্বাসে শ্বাসে জপের প্রতি। 'মুখের মাঝে মুখ দিয়া' কথার ইঙ্গিত একেবারে তাদাত্ম্যের দিকে। 'গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ' দেহমধ্যস্থ নাড়ী-চক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আর 'সর্গমুখে ধায়' কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা ঊর্ধ্বসাধনার ব্যঞ্জনা দিতেছে। এই কবিরই অপর গান আছে—

আবের পত্তন ঘর খাকের বন্দন
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন॥
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি।
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাছনি॥···
দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দিপ যলে।
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বলে॥ ৩৮ সং

পদটির ভিতরকার সকল ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না (অনেক সময় পদ-কর্তার মনেও হয়ত সব কথা স্পষ্ট নয়)—তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'আবের (জলের) পত্তন (পত্তন, ভিত্তি) ঘর খাকের (মাটির) বন্দন (বন্ধন)' হইল পঞ্চভূতাত্মক দেহ; 'পবনে চালাইয়া দাগ' প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যোগসাধনার প্রতি; 'রসের ঠিকুনি ঘর' সম্ভবতঃ মস্তকস্থিত চক্র; দুইমুখী ফুল বোধ হয় সহস্রারস্থিত 'বিশ্বপদ্মে'র (উভয়মুখী পদ্ম) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; 'দিপ (দীপ) ঘলে (জ্বলে)' দিব্যজ্যোতি বা 'নূরে'র সন্ধান দিতেছে।

ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি—

> এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ॥…
> রূপের ঘরে রূপ জ্বল্‌তেছে বিনা চক্ষে দরশন ॥
> কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ।
> আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুন্নিতে দরশন ॥ ৪৩ সং

'রূপের ঘরে রূপ'ই হইল স্বরূপ, তাহাকে 'বিনা চক্ষে দরশন',—ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই স্বরূপ—শুধু বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য। জীয়ন্তে মরা না হইলে, অর্থাৎ বাহিরের দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হইলে এই সাধনা হয় না; দেহস্থ ত্রিনাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না=গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) সংগম যেখানে সেখানেই ত্রিধারা মিশিয়া ঊর্ধ্বস্রোতা একধারা হইয়া যায়—সেই ত্রিবেণীতেই ত বেণীমাধব কৃষ্ণের দর্শন মিলে।

যোগসাধনার মধ্যে নাদ-সাধন মধ্যযুগের অনেক প্রেমসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। নাদ-সাধনের মধ্যে অনাহত-ধ্বনিতত্ত্ব একটি প্রধানতত্ত্ব। কোন কোন মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত এই অনাহত নাদতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্ত্বের আভাস পাই।—

> আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি
> ঝঙ্কারে বাজিছে দিনরজনী।
> কে বাজায় কোথায় বসে চলো যাই তার উদ্দেশে
> মন কাহাইয়া সেই দেশে তারে চিন নি ॥ ৪৪ সং

রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন—

ত্রিপুন্নিয়ার (=ত্রিবেণীর) ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাঁশী গো।
এগো বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী।...
দমে নামে মিলন করি বাঁশীর উপর ধ্যান করি গো।
এগো দেখ চাইয়া তোর না মোকামে (=দেহে) বিরাজ করে নীলমণি।

৮৩ সং

আমরা আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য হয়ত খুব বেশি নয়; কিন্তু বৈষ্ণব ভাবদৃষ্টি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয়। বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-মননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

[বিশ্বভারতী—মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩

বর্ণানুক্রমিক কবি-সূচী

১। অন্ধান
২। আকবর আলী
৩। আছদ্দিন
৪। আবঝল
৫। আবদুল বারী
৬। আবদুল মালী
৭। আবদুল মালীক
৮। আবাল ফকির
৯। আবুল হুছন
১০। আমান
১১। আরকুম
১২। আলাওল
১৩। আলিমদ্দিন
১৪। আলি রজা
১৫। আলী মিঞা
১৬। আসরফ
১৭। ইরকান
১৮। ইরফান
১৯। উছমান
২০। উদাসী
২১। উম্মর
২২। এবাদোল্লা
২৩। এর্শাদুল্লা
২৪। ওয়াহিদ
২৫। ওহাব (ক)
২৬। ওহাব (খ)
২৭। কবীর
২৮। কমর আলী
২৯। কালা শা
৩০। কালীপ্রসন্ন (মুন্সী বোলায়েৎ হোসেন)
৩১। কাসিম
৩২। খতিশা
৩৩। খলিল
৩৪। খাতাশা
৩৫। গয়াজ
৩৬। গরীব
৩৭। গোলাম হুছন (ক)
৩৮। গোলাম হুছন (খ)
৩৯। চাঁদ কাজী
৪০। চামারু
৪১। চাম্পাগাজী
৪১ (ক)। ছহিফা বানু
৪২। ছাওয়াল শা
৪৩। জালালউদ্দী
৪৪। তম্বা
৪৫। তুফানদ্দিন
৪৬। দানেশ
৪৭। দুলা মিঞা
৪৮। দৈখুরা
৪৯। নওয়াজিস
৫০। নজর মোহাম্মদ
৫১। নজির
৫২। নশীর মামুদ
৫৩। নাকিস্ত
৫৪। নাসির
৫৫। নাসিরদ্দিন
৫৬। নাসির মোহাম্মদ
৫৭। নেমত হোসেন
৫৮। পাগলা কানাই
৫৯। পাঙ্কশাহ
৬০। পির মোহাম্মদ
৬১। ফএজর রহমান
৬২। ফকীর শাহ
৬৩। ফজল
৬৪। ফজলল হক
৬৫। ফতন
৬৬। ফতেখান
৬৭। বক্সাআলী
৬৮। বদিয়ুজ্জমা
৬৯। বদিয়ুদ্দিন
৭০। বহরাম
৭১। বুরহানী
৭২। ভেলা শা
৭৩। মছনতাজ
৭৪। মতাহির
৭৪ (ক)। মনকর
৭৫। মনোহর

৭৬। মনোঅর (মন্থুঅর)
৭৭। মর্তুজা গাজী
৭৮। মিয়াধন
৭৯। মির ফএজোল্লা
৮০। মীর্জা কাঙ্গালী
৮১। মীর্জা ফয়জুল্লা
৮২। মুছা
৮৩। মোছন আলী
৮৪। মোহাম্মদ
৮৫। মোহাম্মদ আলী
৮৫ (ক)। মোহম্মদ চুহর
৮৬। মোহাম্মদ পরাণ
৮৭। মোহাম্মদ হানিফ
৮৮। মোহাম্মদ হাসিম
৮৯। রউফ
৯০। রজব
৯১। রহিমুদ্দিন
৯২। রেয়াছক
৯৩। লালন
৯৪। লালবেগ
৯৫। লাল মামুদ
৯৬। শাহ আকবর
৯৭। শীতালং
৯৮। শেখ কবির
৯৯। শেখ ভিখন
১০০। শেখ লাল
১০১। সদাই শাহ
১০২। সমসের
১০৩। সর্ফতোল্লা
১০৪। সালবেগ
১০৫। সিরতাজ
১০৬। সেরচান্দ
১০৭। সৈয়দ আইনদ্দিন
১০৮। সৈয়দ আলী
১০৯। সৈয়দ জহরুল হছেন
১১০। সৈয়দ নাছিরদ্দিন
১১১। সৈয়দ নিয়ামত
১১২। সৈয়দ মর্তুজা (ক)
১১৩। সৈয়দ মর্তুজা (খ)
১১৪। সৈয়দ শাহনূর
১১৫। সৈয়দ সুলতান
১১৬। সোন্দর ফকীর
১১৭। হবিব
১১৮। হাছন রজা
১১৯। হাসমত
১২০। হাসিম
১২১। হুছন

বর্ণানুক্রমিক পদের প্রথম ছত্রের সূচী